Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সেকুলারিজম না শারিয়াহ কোনটা উত্তম? কেন উত্তম?


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া আক্তার মিম

রোলঃ 227020833


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

### সেকুলারিজম না শারিয়াহ কোনটা উত্তম? কেন উত্তম?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া আক্তার মিম

রোলঃ 227020833

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেকুলারিজম না শারিয়াহ কোনটা উত্তম? কেন উত্তম? " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারিয়া আক্তার মিম, আইডিঃ 227020833 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সেকুলারিজম না শারিয়াহ কোনটা উত্তম? কেন উত্তম? ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Mariya

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

**মারিয়া আক্তার মিম**

আইডিঃ 227020833

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


সেকুলারিজম কী? ........ 1

‘সেকুলারিজম’ এর আত্মপ্রকাশ ........ 5

সেকুলারিজমের ভিত্তি ........ 8

হিউম্যানিজম: সেকুলারিজমের আইন ও অথরিটি ........ 15

মুসলিম বিশ্বে সেকুলারিজমের অনুপ্রবেশ ........ 16

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ........ 18

ইসলামী বিশ্বে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার কুফল ........ 26

ইসলামি শারিয়াহ কী? ........ 29

ইসলামি শরিয়ার পরিচয় ........ 32

দীন ও শরিয়া ........ 33

ইজতিহাদের নির্দেশনা ও সূচনা ........ 43

মাকাসিদে শরিয়া (objectives of shariah) ........ 46

ইসলামি শরিয়ার বৈশিষ্ট্য ........ 47

ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগক্ষেত্র সমূহ ........ 49

ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ........ 50

অমুসলিমদের সঙ্গে উঠাবসা ........ 55

অমুসলিমদের প্রতি জুলুম করা নিষিদ্ধ ........ 56

অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো কথাবার্তা ........ 56

অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া ........ 58

অমুসলিম মৃতদের সম্মান করা ........ 60

অমুসলিমদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ ........ 61

অমুসলিম বন্দিদের সঙ্গে সদাচার ........ 62

ইসলামের উদারতায় প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের ইসলাম গ্রহণ .................................................. 65

অমুসলিমদের দান-সদকা করার বিধান .................................................................. 67

অমুসলিম অত্মীয়-স্বজনের অধিকার........................................................................ 68

সেকুলারিজম না শারিয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম? ....................................................... 69

# সেকুলারিজম কী?

Secular ইংরেজি ভাষার একটি শব্দ। এ শব্দটি ল্যাটিন ভাষার Saeculum শব্দ থেকে এসেছে। Saeculum শব্দের অর্থ হলো- ইহজগৎ। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়- ইহজগৎ, বর্তমান দুনিয়া ও ইহজীবন সম্পর্কিত বিষয়াদি।

যে মতবাদটিকে ইংরেজিতে secularism বলা হয় তার আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে বহুলভাবে علماني ['আলমানি] শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' শব্দ দিয়ে।

ইংরেজি অভিধানে secularism শব্দের নিম্নরূপ অর্থ এসেছে:পার্থিববাদী অথবা বস্তুবাদী, ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক নয়, দ্বীনপালনকারী নয়, দুনিয়াবিমুখ নয়। সেকুলারিজম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নে এর কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো:

১.Encyclopedia Americana এর ২৪ নং Volume এ সেকুলারিজমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে:
Secularism is an ethical system founded on the principles of natural morality and independent of revealed religion or super naturalism.
সেকুলারিজম একটি নৈতিক ব্যবস্থা, যা কেবল প্রাকৃতিক নৈতিকতার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশী সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বা রহস্যবাদমুক্ত।

২.Holyoake যিনি সেকুলারিজম নামকরণের প্রথম উদ্যোক্তা এবং যিনি Secular Society গঠন করে এর পক্ষে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, তার লিখিত A Confession of Belief বইতে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:
A form of opinion which concerns itself only with the questions, the issues of which can be tested by the experience of this life.

সেকুলারিজম হল এক ধরনের মতামত যা ইহজগতে এই জীবনের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা সম্ভব বিষয়গুলোকে স্পর্শ করে।

তায় পরাক্ষা সম্ভব বিষয়গুলোকে স্পশ করে।

৩.English Secularism *বইয়ের প্রদত্ত সংজ্ঞা: Secularism is a code of duty pertaining to this life, founded on consideration purely human and intended mainly for those who find theology indefinite, inadequate, unreliable or unbelievable.

সেকুলারিজম এমন একটি কর্তব্য পালন পদ্ধতি, যা শুধু ইহজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও কেবলমাত্র মানবীয় বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের জন্য যারা ধর্মতত্ত্বকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে।

8. Oxfor Dictionary তে Secularism এর সংজ্ঞা: Secularism means the doctrine morality should be based solely onregard to the wellbeing of mankind in the present life, to exclusion of all consideration drawn from belief in God or in future life.

সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদে মানবজাতির ইহজগতের কল্যাণ চিন্তার উপর গড়ে উঠবে এমন এক নৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোনো ধরনের আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাসভিত্তিক বিবেচনা।

৫.Encyclopedia বা বিশ্বকোষে Secularism এর নিম্নরূপ দুটো সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:

No-1. Secular spirit or tendency especially a system of political or social philosophy that reject all from of religious faith.

সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক সংস্থা পরিচালনায় কোনো ধরনের ধর্মীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত হবে না.। এখানে যে অনুবাদ দেওয়া হয়েছে তা মূল বইয়ের ২ নং Defination এর অনুবাদ।

৬.Random House Dictionary of English Language (College Edition, New york-1968) গ্রন্থে Secularism এর তিনটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:

No-1. Not regarded as relgious & spiritually sacred. সেকুলারিজম এমন একটি মতবাদ যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

No-2. Not partaining to or connected with any religion. যা কোনোভাবেই ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

No-3. Not belonging to a religious order.

ধর্মীয় আইন-কানুন বহির্ভূত ব্যবস্থা।

৭.The Advanced Learners' Dictionary of Current Engligh এ সেকুলারিজমের প্রদত্ত সংজ্ঞা:

-Worldly or material, not religious or spiritual.

ইহজাগতিক অথবা পার্থিব, ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক নয়।

The view that morality & education should not be based

সেকুলারিজম এমন একটি ব্যবস্থা যার অধীনে নৈতিকতা ও শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের উপর ভিত্তি করে হবে না।

৮.Oxford Advanced- Learners' Dictionary'র প্রদত্ত সংজ্ঞা:

The belief that religion should not be involved in the organisation of society, education etc.

সমাজ সংগঠন, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না এমন বিশ্বাসের নাম হলো সেকুলারিজম।

৯.Wikipaedia তে সেকুলারিজমের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে:

সেকুলারিজম জ্ঞান হলো সেই জ্ঞান, যার ভিত্তি রয়েছে ইহকালে, যা এই জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ জগতের কল্যাণ সাধন করে এবং যা এ জগতের অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা করা সম্ভব।

১০. Encyclopedia of Religion & Ethics এ প্রদত্ত সংজ্ঞা:

মানবকল্যাণ নির্ধারিত হবে যুক্তির মাধ্যমে। ওহি বা ধর্মীয় নির্দেশনার মাধ্যমে নয়। আর যুক্তি পরীক্ষিত হবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

১১. মুক্তধারা প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডে- Secularism তথা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'সমাজ ব্যবস্থা এমন নীতির উপর নির্ভর করিবে যাহাতে মানুষের নৈতিক আচরণ ও আচরণ-মান ইহকালীন ব্যাপার ও সামাজিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত ও নির্ধারিত হয় এবং তজ্জন্য ধর্মের অনুশাসনের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নাই।'

১২. বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত English-Bengali Dictionary তে- Secular শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে- পার্থিব, ইহজাগতিক, জড়জাগতিক, লোকায়ত। আর Secularism সম্পর্কে বলা হয়েছে-নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয় এই মতবাদ; ইহজাগতিকতা, ইহবাদ।

১৩. A Short History of Secularism (Published in 2008 by I.B. Tauris & Co. Ltd, London) এর লেখক Graeme Smith সেকুলারিজমের ব্যাপারে লেখেন:

The latin term from which the word 'Secular' is derived- 'Saeculum' means generation or age and came to mean that which belongs to this life, to the here and now in this world.

It is used as a short hand for the ideology which shape contemporary society without reference to divine.

ল্যাটিন শব্দ- 'Saeculum' থেকে Secular শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। Saeculum এর অর্থ যুগ, জেনারেশন। পরিভাষাগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়- যা ইহজগৎ, বর্তমান দুনিয়া ও এই জীবন সম্পর্কিত। এটা ব্যবহৃত হয় ঐ আদর্শের শিরোনাম হিসেবে যে আদর্শ স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ (ওহি) বাদ দিয়ে সমসাময়িক সমাজ বিনির্মাণ করেছে।

Graeme Smith আরো বলেন Secularism was born of cristianity, daringly & originally. It is impossible to understand the idea of Secular without appreciationg that, at root, it is cristian.

এটা নির্ভয়ে বলা যায় যে, মূলত খ্রিস্টবাদ থেকে সেকুলারিজমের জন্ম। এটা না বুঝার কোনো কারণ নেই যে, সেকুলার আইডিয়ার মূল জড় খ্রিস্টবাদের অভ্যন্তরে নিহিত।

## ‘সেকুলারিজম’ এর আত্মপ্রকাশ

খৃস্টীয় পাশ্চাত্য সমাজ একসময় ধর্মীয় দোদুল্যতায় ভূগছিল, যা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উর্বর ভূমি ও অনুকূল পরিবেশ, তখন সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ নামক বিষবৃক্ষটি জন্ম নেয় ও বেড়ে উঠে। ফ্রান্সে ঘটে যাওয়া প্রসিদ্ধ বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম ফ্রান্সই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের উপর রাষ্ট্রীয় কাঠামো দাঁড় করায়। এ মতবাদটি যদিও তার অভ্যন্তরে নাস্তিকতা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে দ্বীনকে দূরে সরিয়ে রাখা, এমনকি দ্বীনের সাথে শত্রুতা-বিদ্বেষ ও দ্বীন বিরোধিতা ইত্যাদি মারাত্মক চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড লালন করত, তারপরও তখনকার সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের আত্মপ্রকাশ ও তার অনুশীলন অনাকাঙ্ক্ষিত ও অদ্ভুত ছিল না, কারণ;

**প্রথমত:** সে-সময় তাদের ঈসায়ী দ্বীন আল্লাহর নিখাদ ওহী ভিত্তিক ছিল না, যা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল ঈসা ইবনে মারয়াম ‘আলাইহিস সালামের নিকট প্রেরণ করেছেন, বরং তাতে বিকৃতি ও মিথ্যার হাত অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছিল, তাই তাদের দ্বীন ছিল বিকৃত, পরিবর্তিত, বর্ধিত ও হ্রাসকৃত, যা মানব কল্যাণের বিপরীত অবস্থান নিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথেও তা ছিল সাংঘর্ষিক। সে-সময় ধর্মীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দানকারী গির্জাগুলো তাদের সন্ন্যাসী ও সংসারবিরাগীদের বিকৃতি ও পরিবর্তনকে শুধু সমর্থন নয়, দ্বীন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যা পালন করা ও যার উপর অটল থাকা তখন প্রত্যেকের উপর ফরয ছিল। বৈজ্ঞানিক ও গবেষকদের বিরুদ্ধে গির্জায় অভিযোগ করা হয়, ফলে গির্জা তাদেরকে শাস্তি দেয়, কারণ তারা বিকৃত দ্বীনের বিপরীত আবিষ্কার করেছে, তাদেরকে যিন্দিক ও নাস্তিক বলে অপবাদ দেয়, অতঃপর তাদের অনেককে করা হয়েছে হত্যা, আবার অনেককে দেওয়া হয়েছে জ্বালিয়ে এবং তাদের বহুসংখ্যককে করা হয়েছে জেলে বন্দি।

**দ্বিতীয়ত** -খৃস্টানদের ধর্মীয় মুখপাত্র- গির্জাগুলো অত্যাচারী বাদশাহদের সাথে অনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাদেরকে পবিত্র ও নিষ্পাপ সত্ত্বা হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা প্রজাদের উপর যে জুলম ও অত্যাচার করত, গির্জাগুলো সেগুলোর বৈধতা প্রদান করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এটাই প্রকৃত ধর্ম, যার শরণাপন্ন হওয়া ও যার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সবার জন্য জরুরি।

তাই মানুষ গির্জার জেলখানা ও তার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজে। তখন খৃস্টীয় দ্বীন থেকে বের হওয়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, জীবন-ঘনিষ্ঠ সকল বিষয় যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও আদর্শ ইত্যাদি থেকে তাকে দূরে রাখা, বরং বিতাড়িত করা ব্যতীত মুক্তির কোনো উপায় ছিল না, কারণ তা জালেমদের পক্ষাবলম্বন ও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।

তাদের জন্য কতই না ভালো হত, যদি তারা সেই বিকৃত খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করত, কিন্তু তারা সে বিকৃত খৃস্টান ধর্মের উপর বিরক্ত হয়ে সকল দ্বীনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেই সেকুলারিজম  মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে।

সেকুলারিজমের তিনটি বাংলা অনুবাদ হতে পারে। যথা: ১। ইহজাগতিকতাবাদ ২। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ৩। ধর্মহীন মতবাদ।

১. ইহজাগতিকতাবাদ

এটাই সেকুলারিজমের সঠিক অনুবাদ। Secularism ল্যাটিন শব্দ Saeculum শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। Saeculum শব্দের অর্থ ইহজগৎ। এ মতবাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ ইহজগৎকেন্দ্রিক।

২. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

এটি Secularism এর সঠিক বাংলা অনুবাদ নয়। তবে সমাজে এ অনুবাদ প্রচলিত হয়ে গেছে। ধর্ম ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয় জগৎকে স্বীকার করে। কিন্তু সেকুলারিজম কেবলমাত্র ইহজগৎ স্বীকার করে আর পরজগতকে করে অস্বীকার। তবে Secularism is fully independent of religious ideas and religion

অর্থাৎ ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক (Independent) মতবাদের নাম হলো Secularism. এ অর্থে এর অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চলতে পারে। যে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় ও কার্যকলাপে ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল, সে হলো ধর্মের পক্ষের লোক। আর যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিশ্বাসের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সৃষ্টিকর্তা, ওহি, আসমানি কিতাব, রিসালাত, আখিরাত, পুনরুত্থান, শেষবিচার, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন থেকে পৃথক (Independent) থাকল, সে হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের মধ্যে 'নির' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। 'নির' এর অর্থ 'নেই' অর্থাৎ ধর্মের পক্ষে নেই। অথবা ধর্মের 'অপেক্ষা' নেই যার। বাংলা একাডেমির অভিধানে 'অপেক্ষার' এক অর্থ করা হয়েছে ভরসা/নির্ভরতা অর্থাৎ যে ব্যক্তির ধর্মের উপর ভরসা বা নির্ভরতা নেই, সেই হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

৩. ধর্মহীন মতবাদ

যেহেতু ধর্মের প্রতি এ মতবাদের আস্থা নেই- তাই এ মতবাদ হলো ধর্মহীন মতবাদ।

৪. সেকুলারিজমের আরবি অনুবাদ (একমাত্র পরিভাষা) 'আল লাদিনিয়াহ' অর্থাৎ ধর্মহীন মতবাদ।

৫. ফ্রেঞ্চ ভাষা ব্যবহারকারী অঞ্চলে Secularism কে Laicism বলা হয় যার অর্থ- 'অধর্মীয় ব্যবস্থা' ।অতএব সেকুলারিজম মানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ না বরং ধর্মহীন মতবাদ।

## সেকুলারিজমের ভিত্তি

সেকুলারিজমের মুলত পশ্চিমা সভ্যতার একটি রুপ ।প্রতিটা সভ্যতার মৌলিক দর্শন আছে। ইতিহাসের নির্যাস থেকে যে বিষয়টা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তা হলো এই নতুন পশ্চিমা সভ্যতা মৌলিকভাবে তিনটি বিশ্বাস ও আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা প্রাচীন জাহেলি সভ্যতাগুলোরই ভিন্ন রূপমাত্র। সেগুলো হলো-

(১) স্বাধীনতা

(২) সমতা

(৩) এবং উন্নতি।

এবার আমরা ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

### ১. ১ স্বাধীনতা

পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বাধীনতার অর্থ হলো, ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার দায়িত্ব নেওয়া ব্যক্তির অধিকার। Right to define good and bad. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষেরই ক্ষমতা রয়েছে সে নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণ ৬৩ করবে। প্রকৃত কল্যাণ এটাই যে, মানুষ নিজে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখবে। (Good is the right of individual) আমি যা ইচ্ছা তাই করব এবং যেই পদ্ধতি পছন্দ সেই পদ্ধতিতেই করব। (তবে এর সীমানা আছে, common good নামে একটা কথা আছে) কোনো অথরিটির কাছে এই ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসিত নই; সেই অথরিটি বংশ হোক কিংবা মা-বাবা কিংবা হোক খোদা। তার মানে প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে- সে যা ভালো মনে করবে, তা করতে পারবে। সমকামিতাকে ভালো মনে করলে সে তাও করতে পারবে। পুরুষকে বিবাহ করবে নাকি মহিলাকে, এটা চয়েজ করার ক্ষমতা ও অধিকার তার আছে। সে পর্দা করবে কি করবে না এ ব্যাপারে কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না। কোনো মুসলিম পুজোয় অংশগ্রহণ করলে কেউ এটাকে খারাপ বলতে পারবে না, কেউ বাধাও দিতে পারবে না।

মোটকথা, ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেওয়াই হলো স্বাধীনতা। কারণ তার আকল আছে। আর আকল থাকা অবস্থায় অন্য কেউ তার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আকলই তার জন্য যথেষ্ট। ফরাসি বিজ্ঞানী দেকার্ত

দৃষ্টিভঙ্গিজনিত এই স্বাধীনতার প্রবর্তক। সাথে সাথে কান্টেরও ভালো অবদান আছে এর পক্ষে।

## ১.২ স্বাধীনতার ইসলামি দৃষ্টিকোণ

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্বাধীনতাকে একটি উদ্দেশ্য এবং মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়। freedom as value. পাশ্চাত্য সভ্যতা রাষ্ট্রীয়ভাবে এই দাবি করে যে, রাষ্ট্র এমন পলিসি গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির যা ইচ্ছা তা করতে পারার ক্ষমতা তৈরি হবে। তার এই পথে কেউ বাধা হতে পারবে না (তবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব খর্ব করার অর্থে এর একটা সীমানা আছে...)।

পক্ষান্তরে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা হলো আল্লাহকর্তৃক সংজ্ঞায়িত ভালো-মন্দের যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার যোগ্যতা। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তার হেদায়েতের ব্যবস্থা করেছেন; কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে তাকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং তার মাঝে এই যোগ্যতা দিয়েছেন যে, সে হক গ্রহণ করে রবের নিষ্ঠাবান গোলাম হয়ে থাকবে অথবা হক অস্বীকার করে খোদাদ্রোহী হবে। অন্যভাবে বললে- ধর্মীয় গণ্ডিতে স্বাধীনতার অর্থ হলো ধর্মকর্তৃক নির্ধারিত ভালো-মন্দ দুইয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করার যোগ্যতা (ability to choose between good and bad)। ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার অধিকার মানুষের নেই, যাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা স্বাধীনতা বলে। ইসলামে স্বাধীনতার ধারণা এই নয় যে, ব্যক্তি যদি নিজ ইচ্ছায় কুফর গ্রহণ করে তা হলে তা-ই ভালো। বরং এটা মন্দ এবং এর জন্য অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

**الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِينَ نَارًا**

হক তো তা-ই, যা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে। যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা অস্বীকার করবে। তবে আমি অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি।

আয়াতের শুরুতেই সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, সত্য তা-ই, যা রবের পক্ষ থেকে আসে। সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করার এখতিয়ার মানুষের নেই। তবে

সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মিথ্যা গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে। এটা স্বাধীনতা নয়, পরীক্ষা।

সুতরাং ইসলামে স্বাধীনতা একটি মাধ্যম মাত্র (freedom as resource)। অন্যান্য সৃষ্টিজীবের বিপরীতে মানুষের এই মাধ্যম ও যোগ্যতা রয়েছে যে, সে আল্লাহর নির্ধারণ-করা ভালো-মন্দ থেকে একটি গ্রহণ করতে পারবে। মূল উদ্দেশ্য স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার অধিকার নয়; বরং তাকে রবের তরফ থেকে আসো সত্য মিথ্যা নিধারণ করার এখাতয়ার মানুষের নেই। তবে সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মিথ্যা গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে। এটা স্বাধীনতা নয়, পরীক্ষা।

সুতরাং ইসলামে স্বাধীনতা একটি মাধ্যম মাত্র (freedom as resource)| অন্যান্য সৃষ্টিজীবের বিপরীতে মানুষের এই মাধ্যম ও যোগ্যতা রয়েছে যে, সে আল্লাহর নির্ধারণ-করা ভালো-মন্দ থেকে একটি গ্রহণ করতে পারবে। মূল উদ্দেশ্য স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার অধিকার নয়; বরং তাকে রবের কাছে অর্পণ করে দেওয়া। আরো স্পষ্ট করে বললে ইসলামে আবদিয়্যাতই হলো মূল বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ভালো মন্দ গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকবে। কিন্তু ধর্ম কর্তৃক সংজ্ঞায়িত মন্দ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। এজন্য মুসলমানদের পলিসি তা-ই হবে, যা আবদিয়্যাত তথা আল্লাহর আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিমা অর্থে স্বাধীনতাকে দৃঢ় করে এমন কোনো পলিসি মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না।

বুঝা গেল, পশ্চিমা স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে আবদিয়্যাতকে প্রত্যাখ্যান করে। এটা অস্বীকার করে যে, মানুষ আল্লাহর বান্দা; তাই তার একমাত্র কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। কারণ, স্বাধীনতার মূল কথা দাঁড়ায়, মানুষের প্রকৃত অধিকার, প্রভুত্বের দাবি (self- determination), যা মূলত হেদায়েত লাভের মাধ্যম খোদায়ি প্রত্যাদেশ মেনে নেওয়াকে অস্বীকার করে। সাথে এটা ইসলামের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করে। এই স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার অর্থ হলো- ইসলামও সত্য। ইসলাম একমাত্র সত্য নয়। সত্যের কয়েকটি ধারণার মাঝে ইসলাম একটি। এর বাইরে আরো সত্য আছে। অথচ ইসলাম দাবি করে, সে একমাত্র হক। এর বাইরে যা কিছু আছে, সব বাতিল ও ভ্রান্ত।

## ২. ১ সমতা

পাশ্চাত্য স্বাধীনতা যখন এটা মেনে নিয়েছে যে মানুষের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার অধিকার তার নিজের তখন প্রত্যেকের জন্য জরুরি হলো, সে অন্যের ব্যাপারেও এই সম-অধিকার মেনে নেবে। তাকে মানতে হবে, আমি যেমন নিজেরটা ঠিক করি, আরেকজনও তারটা ঠিক করবে। তার মাপকাঠিও ঠিক, আমারটাও ঠিক। ভালো-মন্দের সমস্ত মাপকাঠি সমান। কোনো মাপকাঠিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। সবার

নির্ধারিত ভালো-মন্দকে সমপর্যায়ের জ্ঞান করতে হবে। এটাই পাশ্চাত্য সমতা। অন্যভাবে বললে, মানুষ নিজ মস্তিষ্ক দিয়ে ভালো-মন্দ নির্ধারণ ৬৮ করবে। আর প্রতিটি মানুষেরই মস্তিষ্ক রয়েছে। সুতরাং মস্তিষ্কের বিচারে যেহেতু সবাই সমান; তাই বিশ্বাস ও অধিকারের প্রশ্নেও সবাই সমান হবে। নারী-পুরুষ, কাফের-মুসলিম, বাবা-ছেলে, মা-মেয়ে সবাই সমান। এই হিসেবে প্রতিটি ধর্মই সমান। কোনো ধর্মকে খারাপ বলা যাবে না, যদিও তা কুফর হয়। শিরক হয়। প্রত্যেক ধর্মকেই এক সমান মনে করতে হবে। কেউ তার ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতা ব্যবহার করে কুফরকে বেছে নিলে তাকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। কোনো হারাম অবলম্বন করলেও তাকে মন্দ বলা যাবে না। সবার চয়েজকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

## ২.২ ইসলামের দৃষ্টিতে সমতা

ইসলামের দৃষ্টিতে সমতার এই ধারণা আল্লাহর নেজামে হেদায়েত প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। সমতা মানে এই দাবি করা যে 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষের ভালো-মন্দ চিহ্নিত করে দেওয়ার জন্য নবী-রাসুলদের মাধ্যমে কোনো সূত্র প্রতিষ্ঠা করেননি। এমনকি মানুষের কাছে এমন কোনো খোদায়ি প্রত্যাদেশ নেই, যা অকাট্য এবং যার ভিত্তিতে খায়েশ ও আমলের মাঝে প্রাধান্য দানের মাপকাঠি নির্ধারণ করা যেতে পারে।' নেজামে হেদায়েতের মর্ম হলো, সমস্ত মানুষের খায়েশ ও কর্ম সমমর্যাদার নয়; বরং যে ব্যক্তির কর্ম নবীদের শিক্ষা অনুযায়ী হবে সে অন্যান্যের উপর প্রাধান্য পাবে। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্র স্বাধীনতা ও সমতাকে কোনো সামাজিক মাপকাঠি ও উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ইসলামি রাষ্ট্র ভালো-মন্দের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হয়ে সমস্ত 'ভালোর ধারণা'কে সমানভাবে সংরক্ষণ করবে, সেই সুযোগ

নেই। বরং ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর নাজিলকৃত একমাত্র কল্যাণের ধারণাকে অন্যান্য কল্যাণের ধারণার (সেগুলো মূলত অকল্যাণ) উপর বিজয়ী করা।অন্যান্যের উপর প্রাধান্য পাবে। কল্যাণের ধারণার (সেগুলো মূলত অকল্যাণ) উপর বিজয়ী করা। সেগুলোর সাথে আপস করা এবং সম-অধিকার ও মর্যাদা দেওয়া ইসলামি রাষ্ট্রের পলিসি নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনি তার রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সেই দীনকে অন্যান্য ধর্মের উপর বিজয়ী করেন।"

ইসলামই একমাত্র ভালো। ইসলামের বাইরে অন্য কোনো ভালোর ধারণা নেই যে তাকে সমান ভাবতে হবে কিংবা তার সাথে সমতা রক্ষা করতে হবে। আর ইসলাম সমতাকে নয়; আদল (ন্যায়) প্রতিষ্ঠা করে। কারণ ইসলামই একমাত্র ন্যায়। এর বাইরে ন্যায়ের কোনো ধারণা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেসব বিধান দিয়েছেন, সেগুলোই আদল। আদলের সংজ্ঞা, সীমা ও প্রকৃতি ইসলামই নির্ধারণ করবে। ইসলামের বাইরে এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যার ভিত্তিতে আল্লাহর বিধানকে আদলের সার্টিফিকেট দিতে হবে। সুতরাং একজন কাফেরকে মন্ত্রী হওয়ার অধিকার না দেওয়াই আদল। কারণ কুফর সত্তাগতভাবেই অনিষ্টকর। আর যে তা ধারণ করে তার নেতৃত্ব কখনোই আদল হতে পারে না। এখানে সম-অধিকারের প্রশ্ন তোলা যাবে না। সামগ্রিকভাবে ইসলাম আদলকে রক্ষা করে; পশ্চিমা অর্থে সমতাকে নয়।

অন্যভাবে বললে, ইসলাম অবস্থানুসারে প্রত্যেকের পর্যায় রক্ষা করার কথা বলে; সমতার নয়। ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া বা খোদাভীতি। ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য লিবারেল রাষ্ট্রের মতো প্রত্যেক সদস্যের জন্য নিজ নিজ খায়েশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার অধিকার ও পরিবেশ নিশ্চিত করা নয়। বরং তাদের খায়েশকে নেজামে হেদায়েতের (ওহির) অনুগামী করার পরিবেশ তৈরি করা। এজন্য ইসলামি রাষ্ট্রনীতিতে citizen (এমন সাধারণ জনতা, যারা মূলত শাসক ও সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হয়ে থাকে) এবং representation of citizens (জনপ্রতিনিধি) এর কোনো ধারণা নেই। কারণ ইসলামে সাধারণ জনতা citizen নয়; বরং প্রজা হয়ে থাকে। আর খলিফা এমন কোনো জনপ্রতিনিধি নয়, যার দায়িত্ব হবে সাধারণ লোকদের খায়েশ মোতাবেক সিদ্ধান্ত দেওয়া। বরং সে আল্লাহ

ও তার রাসুলের প্রতিনিধি। তার লক্ষ্য প্রজাদের খায়েশকে শরিয়তের অনুগামী করার জন্য ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা এবং সমতার অর্থ হলো আল্লাহকর্তৃক নির্ধারিত অধিকার ও আদলের বিপরীতে মানুষ নিজেই ভালো-মন্দ নির্ধারণ করবে। প্রত্যেকের নির্ধারিত ভালোর ধারণা ও জীবনাচার সমাজে সমান অবস্থান রাখে। আর তখন রাষ্ট্রের কাজ হবে এমন সমাজ-ব্যবস্থা তৈরি করা, যেখানে প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ খায়েশ পূরণ করবে এবং তা অর্জন করার জন্য তারা সক্ষম হয়ে উঠবে।”

## ৩. ১ উন্নতি (Development)

স্বাধীনতা ও সমতার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার তৃতীয় মূলনীতি বা আকিদা হলো উন্নতি। সমস্ত কাজ পাশ্চাত্য সভ্যতা এই তিন আকিদার আলোকে মূল্যায়ন করে। এর মধ্য থেকে যেকোনো একটি আকিদা ক্ষুণ্ণ হলে তারা তা সহ্য করে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বিশেষত স্বাধীনতা এবং উন্নতির সম্পর্কটা আরো গভীর। মূলত স্বাধীনতার বস্তুগত রূপ হলো উন্নতি। এখানে উন্নতি বলতেপুঁজির ধারাবাহিক ও সীমাহীন বৃদ্ধিকে বুঝানো হচ্ছে। নৈতিক মূল্যবোধের এখানে কোনো মূল্য নেই। মানুষ তার খোদায়ি আসনে থেকে সমস্ত খায়েশ পূরণ করার যোগ্যতা একমাত্র পুঁজির মাধ্যমেই অর্জন করতে পারে। তাই পুঁজির বৃদ্ধিই উন্নতি। উন্নতি মানে অঢেল অর্থ। বলা যায়, উন্নতির এই ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

## ৩.২ ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতি

পাশ্চাত্য উন্নতির মূলকথা হলো, নফসকে খুশি করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া। সীমাহীন খায়েশ ও চাহিদা পূরণ করতে পারা। কিন্তু ইসলাম কামনা-বাসনা ও চাহিদা সীমাহীন হওয়ার স্বীকৃতি দেয় না। ইসলাম বরং দুনিয়াবিমুখতা ও অল্পতুষ্টির চেতনা ধারণ করে। সীমাহীন কামনা-বাসনা পূরণ ও অবাধ মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে ইসলামে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। ইসলামে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতের সফলতাই একমাত্র লক্ষ্য। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার কাজ পাশ্চাত্য উন্নতি এবং তার জন্য উপযুক্ত পলিসি তৈরি করা নয়। বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব

হলো, এমন ব্যবস্থাপনা তৈরি করা, যেখানে দীনি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, আখেরাতের সফলতা অর্জন করা সহজ হবে, মানুষ যুহুদ ও অল্পতুষ্টির গুণ অর্জন করবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই উন্নতি। যেখানে মানুষের পুঁজি বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু ইসলামি পরিবেশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে, তাকে ইসলাম উন্নতি বলে না। ইসলামের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে তা অবনতি।ইসলামের দৃষ্টিতে যা উন্নতি, পাশ্চাত্যের কাছে তাই পশ্চাদগামিতা। অথচ বাস্তবতা হলো, ইসলাম যাকে পশ্চাদগামিতা বলছে পশ্চিমরা তাকেই গ্রহণ করছে আধুনিকতা ও প্রগতি হিসেবে। মহান আল্লাহ বলেন,

**نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ**

রাসুল হলেন মানবজাতির জন্য একজন সতর্কবার্তা প্রদানকারী। তোমাদের যার ইচ্ছা (তার অনুসরণ করে) উন্নতি করবে। আর যার ইচ্ছা (তার বিরোধিতা করে) পশ্চাদমুখী হবে। ৭৬

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে জনপদবাসী, তোমরা সরল সঠিক পথে (ইসলামের উপর) অবিচল থাকো। এটাই তোমাদের জন্য অগ্রগতি। যদি এই পথ ছেড়ে ডান বা বামের কোনো পথ (সভ্যতা, আদর্শ, মতবাদ) অবলম্বন করো, তা হলে তোমরা পথভ্রষ্ট এবং পশ্চাদমুখী হয়ে পড়বে।' ११

সুতরাং বুঝা গেল, ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতির মূলকথা হলো দীনি পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া, আল্লাহর দীন মানা সহজতর হওয়া এবং শরিয়াহর প্রতিটি আইন প্রতিষ্ঠিত থাকা। পাশ্চাত্যের জিডিপি আর বস্তুগত উন্নয়ন, ইসলামের দৃষ্টিতে আসল উন্নতি নয়।

## হিউম্যানিজম: সেকুলারিজমের আইন ও অথরিটি

পাশ্চাত্য স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ইতোপূর্বে আমরা করে এসেছি। এই তিনটি হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। উল্লিখিত তিন বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে আইনিপ্রক্রিয়া ও প্রস্তাবনা রচিত হয়েছে, তাকে আমরা হিউম্যান রাইটস নামে চিনি। পাশ্চাত্য বিশ্ব এই হিউম্যান রাইটসকে পরম ও অপরিবর্তনীয় মনে করে এবং এর আলোকেই সমস্ত কিছু তারা বিবেচনা করে। সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোর যেকোনো প্রস্তাবনা এবং আইন পাশের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে এই হিউম্যান রাইটস। সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে ইনশাআল্লাহ।

যারা এই হিউম্যান রাইটস-এর চর্চা করে এবং এর উপর বিশ্বাস রাখে, তাদের বলা হয় Human Being বা ব্যক্তিমানব। হিউম্যান বিয়িং নিছক

যারা এই হিউম্যান রাইটস-এর চর্চা করে এবং এর উপর বিশ্বাস রাখে, তাদের বলা হয় Human Being বা ব্যক্তিমানব। হিউম্যান বিয়িং নিছক কোনো মানুষ নয়। সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অমুখাপেক্ষী মনে করে। সমস্ত জীবনব্যবস্থা ও দর্শনকে সে মূল্যায়ন করে পাশ্চাত্য স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির ভিত্তিতে। পাশ্চাত্য সভ্যতার পুরো কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে এই একটি ব্যক্তিসত্তাকে কেন্দ্র করে। আধুনিক কিংবা আলোকিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে হিউম্যান বিয়িং হওয়া। একজন শিক্ষিত মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিউম্যান বিয়িং হওয়া। কেউ যদি হিউম্যান বিয়িং না হতে চায় তা হলে পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে সে মানুষ থাকে না, অমানুষ হয়ে যায়। তার জান মাল ইজ্জত সব বৈধ হয়ে যায় পশ্চিমা বিশ্বের আইনের কাছে।

আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে পুরো বিশ্বে হিউম্যান রাইটস-এর যে স্লোগান বিদ্যমান, তা কখনোই কোনো মানুষের অধিকার হতে পারে না।

# মুসলিম বিশ্বে সেকুলারিজমের অনুপ্রবেশ

খৃস্টীয় পাশ্চাত্য সমাজে এ জাতীয় ঘটনার আত্মপ্রকাশ আশ্চর্য কোনো বিষয় নয়, তবে ইসলামে তার কোনো সুযোগ নেই, বরং কল্পনা করাও অসম্ভব। কারণ ইসলামে রয়েছে আল্লাহর ওহী, যার অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকে বাতিল অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এ দ্বীন বিকৃতি ও পরিবর্তন মুক্ত, তাতে কোনো বিষয় বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করা সম্ভব নয়।

তবে  মুসলিম বিশ্বে সেকুলারিজমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং দিন দিন এই ইমান বিধ্বংসী মতবাদ মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে পরছে।মুসলিম বিশ্বে সেকুলারিজমের অনুপ্রবেশ ঘটেছে নানা ভাবে।

১/ ফরাসী বিপ্লবের পরের ঘটনা এগুলো। বিপ্লবটা ১৭৮০/১৭৯০এর দিকের অর্থাৎ ১৮০০ এর কাছাকাছি সময়ের। ইসলামী খেলাফতের পতনের পরের ঘটনা।

ইসলামী খেলাফত শেষ হওয়ার পর মুসলমানরা এসবের সম্মুখীন হয়েছে। আর পশ্চিমাবিশ্ব যখন তাদের পার্থিব উন্নতি ও মনোরঞ্জনের পথে কিছু কিছু জায়গায় চার্চগুলোতে তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে তাদের বিরোধী মনে করেছে তখন থেকে এ ধরনের চিন্তা কারো কারো মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির প্রসার ঘটেছে।

সেকুলারিজম মুসলমানদের মধ্যে

মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে মুস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্ক (জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১৯৩৮)। ১৯ শতকের শুরুতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। মুসলমানদের সর্বশেষ দারুল খিলাফা তুরস্কে বসে ঐ লোকটি এ কাজ করেছিল। তার ক্ষমতার মেয়াদকাল ছিল ১৯২৩-১৯৩৮ পর্যন্ত। তখনকার সময়ে সেকুলারিজমটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

২/ মুসলিম দেশে বসবাসকারী খৃস্টানরাও বিভিন্ন মিডিয়া ও প্রচার-যন্ত্রের সাহায্যে সেকুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদ আমদানি ও প্রসারের ক্ষেত্রে কম-যায়নি, তাদেরও রয়েছে বড় ভূমিকা ও ক্ষতিকর প্রভাব।

২/ অনুরূপ সেকুলারিজম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলিম শিক্ষানবিশরাও ভূমিকা রেখেছে প্রচুর, যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে গিয়েছিল। সেখানে তারা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও তার আবিষ্কার দেখে ফেতনায় পতিত হয়, অতঃপর সে সকল দেশের প্রচলিত প্রথা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আচার-আচরণ বাস্তবায়ন ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে নিজ দেশে ফিরে আসে। অতঃপর এক শ্রেণির লোক সে সব (বিদেশ ফেরৎ তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী) লোকদের পেশ করা এ সব তথ্য ও নীতিগুলো গ্রহণযোগ্য হিসেবে লুফে নেয়, তাদের ধারণা এরাই উপকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক-বাহক ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। বস্তুত এসব বিদেশ ফেরৎ লোকদের দেখা অভ্যাস, প্রথা ও পদ্ধতি যেগুলো তারা খুব বড় ও মহত চিন্তাধারা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে তা এমন সমাজের-যার সাথে দ্বীনের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে আমরা মুসলিম দেশে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানতে পারলাম, যা আমাদেরকে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে:

**এক.** মুসলিম দেশে বাসকারী খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আমাদের জন্য ক্ষতিকর, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই তাদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আল্লাহ তাদেরকে যে স্থানে রাখতে বলেছেন আমরা তাদেরকে সেখানেই রাখব। তাদেরকে মুসলিম দেশে সামান্যতম কর্তৃত্ব ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ দেব না। সকল মিডিয়া, প্রচারযন্ত্র ও গণমাধ্যমগুলোর দরজা তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য উন্মুক্ত করে রাখব না, বরং বন্ধ করে রাখব, যেন তারা মুসলিমদের মাঝে তাদের বিষ ছড়ানোর সুযোগ না পায়। কিন্তু এ কাজ করবে কে! অধিকন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান সেকুলারিজমের বিষ ছড়ানোর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন পদ ও পদবী দিয়ে রেখেছে! আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, তিনিই আমাদের অভিভাবক।

**দুই.** শিক্ষানবিশদের বহির্বিশ্বে পাঠানোর ঝুঁকিও অনেক। তার পরিণতি ভয়াবহ।

# বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছিল **১৯৭২** সালে। সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রের নতুন সংবিধানের মূলনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। জনগণ তখন জেনেছে এই রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য স্বাধীন হয়েছে। বিজয়ের এক বছর পর **১৯৭২** সালের শেষের দিকে সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত হয়েছে। বস্তুত তখনই দেশের সাধারণ জনগণ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা জেনেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক, অল্প ধার্মিক হোক বা বেশি ধার্মিক যুদ্ধের সময় তারা জানেনি যে, তারা সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য যুদ্ধ করছেন। এটা জেনেছেন তারা **১৯৭২** এর শেষে স্বাধীনতা যুদ্ধেরও আরো এক বছর পরে। কারণ সংবিধানে এই কথা লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে সব কারণে আমাদের দেশের আবাল, বৃদ্ধ, নওজোয়ানরা মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ধর্মনিরপেক্ষতা। এটা সংবিধানে লেখা আছে। এর আগ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য হয়েছে। কোনো ঐতিহাসিক দলিলে সেটা নেই। আপনি আমাদের দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইগুলো, পৌরনীতির বইগুলো পড়লে এর যথার্থতা খুঁজে পাবেন। এছাড়া স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব

পাকিস্তানী জনগণ বহু আন্দোলন করেছে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অনেক আন্দোলন হয়েছে। ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ হয়েছে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। ৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন হয়েছে। এগুলোর কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার নাম-গন্ধও ছিল না। এমনকি আপনি বর্তমান সময়ের (যখন দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়) মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখুন। সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা পাবেন না। সুতরাং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে বলা যায় যে, সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিখিত নিম্নলিখিত বাক্যটি বাস্তবসম্মত নয়।

“আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ... ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।”

সম্ভবত এ কারণেই স্বাধীনতার ঘোষণাকারী মতান্তরে ঘোষণা পাঠকারী জেডফোর্সের কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান প্রথম সুযোগেই এটিকে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন এবং পরবর্তীতে অনেক সেক্টর কমান্ডারকেই জনগণ ধার্মিকরূপে পেয়েছে।

সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিদায়

শেখ মুজিব সরকারের সময়েই সংবিধানে ৪টা সংশোধনী হয়ে গিয়েছিল। এরপর জিয়াউর রহমান ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের আইন থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরিয়ে দেন এবং তার স্থলে ‘মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ বাক্য স্থাপন করেন। দুই যুগেরও বেশি সময় পর্যন্ত সংবিধানে এ বাক্যটি ছিল। এমনকি ১৯৯৬-২০০১ সময়ের আওয়ামী লীগ আমলেও।

‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ বাদ গেল, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ আবার এল

এরপর হঠাৎ একদিন দেশের ধর্মপ্রাণ নাগরিকগণ অবাক বিস্ময়ে শুনলেন যে, তাদের সংবিধান থেকে ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ বাদ দিয়ে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ পুনঃস্থাপিত হয়েছে এবং এ কাজটি করেছেন দেশের উচ্চ আদালত। যদিও আদালতের রায় প্রকাশ করতে গিয়ে মিডিয়াগুলো বলেছে, ৫ম সংশোধনী বাতিল করা হয়েছে। আসলে বিষয়টি তেমন নয়। বরং ৫ম সংশোধনীর অনেক কিছুই আদালত বহাল রেখেছেন। বাছাই করে করে কিছু জিনিস বাতিল করেছে আর কিছু জিনিস আগের মতোই রেখে দিয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, বিচারপতি খায়রুল হক সাহেবের আদালত এ কাজটি করেছে স্বউদ্যোগী হয়ে। তার কাছে কেউ এ ব্যাপারে আবেদন বা মামলা করেনি। বরং একটি সিনেমা হলের মালিকানা সংক্রান্ত্র মামলার রায় দিতে গিয়ে তিনি কাজটি করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে সরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে এনেছেন।

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরপরই বিগত সরকার সে অনুযায়ী সংবিধান মুদ্রণ করে এবং এরপর ১৫তম সংশোধনী এনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনরায় স্থান করে দেয়। এভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দেশের একশ্রেণীর ধর্মবিদ্বেষী শ্রেণী, ধর্মবিরোধী গণমাধ্যমগুলো। আর উপেক্ষিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা।তারপর ২০২৪ এর সর্বশেষ সংশোধনীতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরা দুই ধরনের।

১. ধর্মবিদ্বেষী ও ধর্মদ্রোহী লোকজন। অনেক কট্টর বামপন্থী এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত।

২. আরেক শ্রেণী আছে যারা জায়গা বুঝে কথা বলে। আত্মরক্ষার জন্য যারা ভদ্র সাজে। ভদ্র বলতে যারা একটু রাখঢাক করতে চায়। এরা বলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা নয়। এরা ধর্মনিরপেক্ষতাও রাখবে আবার ধর্ম ওয়ালাদের নারাজও করবে না। এদের উদাহরণ হল।

رحمن بھی راضی رہے اور شیطان بھی بے زار نہ ہو-

আল্লাহও রাজি থাকুক, কিন্তু শয়তানও অসন্তুষ্ট না হোক।

এরা মানুষকে বলে বেড়ায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না; ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার ইত্যাদি। এ লোকগুলো একদিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার আসল সংজ্ঞাকে গোপন করে, অন্যদিকে নিজেদের আসল মতলবকে গোপন রেখে ধর্মপ্রাণ ও ধর্মবিরোধী উভয় গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়।

আমরা আজকে বিশ্লেষণ করব যে, ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্মহীনতা নাকি ধর্মহীনতা নয়। কার কথাটা ঠিক? ধর্মনিরপেক্ষদের দেখলাম যে, তারা বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। এটা তো এই দেশীয় বক্তব্য। অথচ সেক্যুলারিজম তো এদেশে শুরু হয়নি। এ দেশের আগেই এ নীতি প্রচার পেয়েছে।

সেকুলারিজমের তিনটি বাংলা অনুবাদ হতে পারে। যথা: ১। ইহজাগতিকতাবাদ ২। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ৩। ধর্মহীন মতবাদ।

১. ইহজাগতিকতাবাদ

এটাই সেকুলারিজমের সঠিক অনুবাদ। Secularism ল্যাটিন শব্দ Saeculum শব্দ থেকে উদ্ভব হয়েছে। Saeculum শব্দের অর্থ ইহজগৎ। এ মতবাদের সমস্ত চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ ইহজগৎকেন্দ্রিক।

২. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

এটি Secularism এর সঠিক বাংলা অনুবাদ নয়। তবে সমাজে এ অনুবাদ প্রচলিত হয়ে গেছে। ধর্ম ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয় জগৎকে স্বীকার করে। কিন্তু সেকুলারিজম কেবলমাত্র ইহজগৎ স্বীকার করে আর পরজগতকে করে অস্বীকার। তবে Secularism is fully independent of religious ideas and religion অর্থাৎ ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক (Independent) মতবাদের নাম হলো Secularism. এ অর্থে এর অনুবাদ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চলতে পারে। যে ব্যক্তি চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় ও কার্যকলাপে ধর্মের পক্ষে অবস্থান করল, সে হলো ধর্মের পক্ষের লোক। আর যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিশ্বাসের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সৃষ্টিকর্তা, ওহি, আসমানি কিতাব, রিসালাত, আখিরাত, পুনরুত্থান, শেষবিচার, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন থেকে পৃথক (Independent) থাকল, সে হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের মধ্যে 'নির' প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে। 'নির' এর অর্থ 'নেই' অর্থাৎ ধর্মের পক্ষে নেই। অথবা ধর্মের 'অপেক্ষা' নেই যার। বাংলা একাডেমির অভিধানে 'অপেক্ষার' এক অর্থ করা হয়েছে ভরসা/নির্ভরতা অর্থাৎ যে ব্যক্তির ধর্মের উপর ভরসা বা নির্ভরতা নেই, সেই হলো ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি।

৩. ধর্মহীন মতবাদ

যেহেতু ধর্মের প্রতি এ মতবাদের আস্থা নেই- তাই এ মতবাদ হলো ধর্মহীন মতবাদ।

৪. সেকুলারিজমের আরবি অনুবাদ (একমাত্র পরিভাষা) 'আল লাদিনিয়াহ' অর্থাৎ ধর্মহীন মতবাদ।

৫. ফ্রেঞ্চ ভাষা ব্যবহারকারী অঞ্চলে Secularism কে Laicism বলা হয় যার অর্থ- 'অধর্মীয় ব্যবস্থা' ।অতএব সেকুলারিজম মানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ না বরং ধর্মহীন মতবাদ।

সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) এর বিবিধ রূপ

সেকুলারিজমের দু' টি রূপ রয়েছে। যার একটি অপরটি থেকে জঘন্য:

**প্রথম রূপ: সরাসরি নাস্তিকতা:** এ প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) দ্বীনকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তা ধর্মীয় কোনো বিষয় স্বীকার করে না, বরং যারা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ জাতীয় সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারীরা নিজেদের কুফরি, অশ্লীলতা ও কুকর্মে আত্মগর্বী ও অহংকারী। তাদের কুফরির ফয়সালা করা সকল মুসলিমের পক্ষে সহজ। আলহামদুলিল্লাহ তাদের বিষয়টি মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট। কোনো মুসলিম তাদের দিকে ধাবিত হয় না, তবে যে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় সে ব্যতীত। এ ধরনের সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) জনসাধারণের নিকট কম বিপজ্জনক, তারা সাধারণ মানুষকে সহসা ধোঁকায় ফেলতে সক্ষম নয়, তবে দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, মুমিনদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া, অথবা জেল দেওয়া অথবা হত্যা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারাও কম ক্ষতিকর নয়I

**দ্বিতীয় রূপ: পরোক্ষ নাস্তিকতা:**

এ প্রকার নাস্তিকতা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, তাত্ত্বিকভাবে তার উপর ঈমান আনে, তবে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে দ্বীনের কর্তৃত্ব মানে না। তাদের শ্লোগান দুনিয়াকে দ্বীন থেকে পৃথক কর। জনসাধারণকে ধোঁকায় ফেলা ও বিপথগামী করার ক্ষেত্রে এ প্রকার নাস্তিকতা বা সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) অপেক্ষাকৃত বেশি বিপজ্জনক। কারণ তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার ও তার দ্বীনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে না, তাই তাদের কুফরির প্রকৃত অবস্থা অনেক মুসলিমের নিকট প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট থাকে।[2] দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও পর্যাপ্ত ইলম না থাকার কারণে তারা সেকুলারিজমকে (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে) কুফরি বলে মনে করে না। এ কারণে মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশ সরকার সেকুলার

(তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ) মতবাদের অনুসারী। অনেক, বরং অধিকাংশ মুসলিম তাদের হাকিকত জানে না।

এ প্রকার সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) অনুসারী সংগঠনগুলো দ্বীন ও দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও নিশ্চিত থাকে, কেউ তাদের কাফের ও দ্বীন থেকে খারিজ বলবে না। কারণ, তারা প্রথম প্রকারের ন্যায় প্রকাশ্য নাস্তিকতাসহ আত্মপ্রকাশ করেনি। তাদের কাফের না বলা মুসলিমদের মূর্খতার প্রমাণ। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। মুসলিম উম্মতকে দ্বীন বুঝার তৌফিক দিন, তারা যেন এসব সংস্থা ও সংগঠন থেকে আত্মরক্ষা গ্রহণ করে।

অতএব দ্বীন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো মুসলিম সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বীদের কথা বা লেখনীতে আল্লাহর নাম অথবা রাসূলের নাম অথবা ইসলামের নাম শুনে বা দেখে আশ্চর্য হয় না, বরং তারাই আশ্চর্য হয় ও বিস্ময় প্রকাশ করে, যারা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানে না।

আমরা সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি নাস্তিকতা ও পরোক্ষ নাস্তিকতা দু' ভাগে ভাগ করার কারণ সাধারণ লোকেরা নাস্তিকতা বলতে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করাকেই বুঝায়, অথচ সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাও এক প্রকার নাস্তিকতা, বরং নাস্তিকতার একটি শাখা হচ্ছে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

দ্বীনের সাথে পরোক্ষ নাস্তিকতা বা সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) সংঘর্ষ অনেকের নিকট স্পষ্ট নয়, কারণ তাদের নিকট দ্বীন হচ্ছে ধর্মীয় কয়েকটি ইবাদতের নাম। তাই এ পরোক্ষ সেকুলারিজম (পরোক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা) যেহেতু মসজিদে সালাত আদায় ও বায়তুল্লাহ শরীফের হজকে নিষেধ করে না, তারা ধারণা করে নিয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা দীন বিরোধী নয়। কিন্তু দীনকে যারা সঠিকভাবে বুঝেন, তারা অবশ্যই জানেন যে, সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) দীনের সাথে সাংঘর্ষিক। যে মতবাদ মানুষের জীবনের সব শাখায় আল্লাহর শরীয়তকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে, তার চেয়ে স্পষ্ট ও কঠিন ইসলাম বিরোধী কোনো মতবাদ কি আছে? যদি তারা তা বুঝে!

মোদ্দাকথা:

উভয় প্রকার সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) স্পষ্ট কুফরি, এতে কোনো সন্দেহ ও সংশয় নেই। যদি কেউ উল্লেখিত কোনো প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মনেপ্রাণে মেনে নেয়, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত ও মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। কারণ, ইসলামই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান, মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট বিধান রয়েছে, হোক তা আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক বা সামাজিক কোনো শাখা। ইসলাম কখনো কোনো মতবাদকে তার বিধানে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয় না। ইসলামের সকল শাখায় পরিপূর্ণরূপে প্রত্যেক মুসলিমের প্রবেশ করা ফরয। আল্লাহ তা 'আলা ইরশাদ করেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ ٢٠٨

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর" । সূরা বাকারা: (২০৮)

কুরআনুল কারিমের কতক বিধান গ্রহণ করে কতক বিধান ত্যাগকারীকে আল্লাহ তা 'আলা কাফের বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ
فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٨٥ ﴾
[البقرة :٨٥]

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন" ।
(সূরা বাকারা: (৮৫)

ইসলামে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় যে প্রত্যাখ্যান করল, সে কাফের ও পথভ্রষ্ট, যদিও তার প্রত্যাখ্যান করা বিষয়ের পরিমাণ খুবকম ও সামান্য হয়। অতএব পার্থিব রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের সকল বিধান যে প্রত্যাখ্যান

করে, সে কাফের বলার অপেক্ষা রাখে না, যেমন সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা।

দ্বিতীয়ত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের মাঝে ইসলাম বিনষ্টকারী কারণও রয়েছে, যেমন তারা বিশ্বাস করে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে অন্য কারও আদর্শ উত্তম, অনুরূপ তার ফয়সালা থেকে অন্য কারও বিচার-ফয়সালা উত্তম। এ কারণেও তারা কাফের।

শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "ইসলাম বিনষ্টকারী চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করল মানুষের তৈরি আইনি সংস্থাগুলো ইসলামী শরীয়তের বিধান থেকে উত্তম, অথবা বিশ্বাস করল যে, বিংশ শতাব্দীতেইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, অথবা ইসলাম প্রগতির অন্তরায়, অথবা বলল ইসলাম শুধু ব্যক্তি ও তার রবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মানুষের জীবনের অন্য কোনো অংশে প্রবেশ করার অধিকার ইসলামের নেই" ।

# ইসলামী বিশ্বে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার কুফল

ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে আমরা তার কিছু কুফল বর্ণনা করছি:

১. সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দা‘ঈ বা আহ্বানকারীদেরকে তারা নানাভাবে হেয় ও উপহাস করে, সরকারি চাকুরী ও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, যেন তারা জাতি ও যুবকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

২. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কাজই হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও দিগ্বিজয়ী ইসলামী আন্দোলনের ফসল স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জংগলীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

৩. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সেবাদাসরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের সেকুলার মতাদর্শের সেবক বানানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন:

ক. শিক্ষা উপকরণ ও সিলেবাস দ্বারা ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করা।

খ. ধর্মীয় শিক্ষার নির্ধারিত সময় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা ও সংকুচিত করা।

গ. নির্দিষ্ট কতক ধর্মীয় বিষয় পাঠদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যে বিষয়গুলো সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে কিংবা সে মতবাদের ভ্রষ্টতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঘ. শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে বিকৃতি ঘটানো, যেন মানুষ বুঝে শরীয়ত সেকুলারিজম বা তথাকথিত

ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে বুঝে যে, ইসলামের সাথে তার সংঘর্ষ নেই।

ঙ. পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালনকারী শিক্ষকদেরকে পাঠদান ও শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখা এবং ছাত্রদেরকে তাদের সাথে মিশতে না দেওয়া। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন দাফতরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা, অথবা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো পথে তাদেরকে মগ্ন করে দেওয়া।

চ. ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বহীন ও অতিরিক্ত বিষয়ের মান দেওয়া, যেমন শেষ পিরিয়ডে রাখা, যখন ছাত্রদের মাঝে ক্লান্তির ভাব সৃষ্টি হয়, যেন তারা ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত না হয়। আবার এমনভাবে এ বিষয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যে এর সাথে ছাত্রদের পাশ-ফেলের সম্ভাবনা না থাকা।

৪. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী ও মিথ্যা-বিকৃত দ্বীনের অনুসারী যেমন মুসলিম-ইয়াহূদী-খৃস্টান ও নাস্তিকদের থেকে পার্থক্য তুলে দেয়া, অতঃপর সবাইকে এক মানদণ্ডে রাখা ও বাহ্যিকভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা কাফের, নাস্তিক, পাপাচারী ও অপরাধীদেরকে তাওহীদের ধারক-বাহক, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ইমানদার লোকদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এ মতবাদের সামনে মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহূদী, ব্রাহ্মণ, মূর্তিপূজক সবাই সমান, তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তখনই তাদের কাছে মুখ্য হবে যখন কেউ তাদের মতবাদের আহ্বানে সাড়া দিবে।

এ মতবাদের ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে খৃস্টান, ইয়াহূদী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা সমাজতন্ত্রীর সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে বৈধ, কোনো সমস্যা নেই, অনুরূপ তার দৃষ্টিতে মুসলিম দেশে ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান অথবা অন্য কোনো কুফরি ধর্মের অনুসারীর শাসক হতে সমস্যা নেই।

তারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিম দেশের কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে তুলে দিতে চায়।

বরং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ ও দেশের অখণ্ডতাকে মূলনীতি ও একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হিসেবে দেখে। কুরআনুল কারীমের যে অংশ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস তাদের এ তথাকথিত জাতীয় ঐক্য বা

জাতীয়তাবাদ নীতি বিরুদ্ধ হয়, তাকেই তারা ছুড়ে ফেলে ও প্রত্যাখ্যান করে। আর বলে: এটা দেশীয় একতা ও ঐক্য বিনষ্টকারী!

৫. এ মতবাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করা এবং পারিবারিক সিস্টেম ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন:

ক. অশ্লীলতাকে বৈধতা দেওয়া ও তার জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা; যার দৃষ্টিতে ব্যভিচার ও সমকামিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি।

খ. শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ও সেগুলোর সহায়তায় নিয়োজিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা। কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে সেসব অশ্লীলতা প্রচারে রত থাকা।

গ. স্কুল-ভার্সিটি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে পর্দা নিষিদ্ধ করা এবং অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাকে চাপিয়ে দেওয়া।

# ইসলামি শারিয়াহ কী?

ইসলামি শারিয়াহ কী বুজতে হলে আগে বুজতে হবে ইসলাম কি?
ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ :ইসলাম (আরবি: الإسلام) শব্দটি এসেছে আরবি -س ل-م শব্দটি হতে; যার দু'টি অর্থঃ ১. শান্তি ২. আত্মসমর্পণ করা।

এর পারিভাষিক অর্থ: ইসলাম হলো তাওহীদ (একত্ববাদ) ও আনুগত্যের সহিত এক আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা এবং শিরক থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা।এ সম্পর্কে
আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নিজেকে সোপর্দ করে, তার চাইতে উত্তম দ্বীন আর কারো নিকট আছে কি?" (সূরা নিসাঃ ১২৫)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

"আর যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ন হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্ অভিমুখী করে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল"। (সূরা লুকমানঃ ২২)

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

"তোমাদের সত্য মা'বুদ হচ্ছেন মাত্র একজন (আল্লাহ)। সুতরাং তোমরা তাঁরই জন্য অনুগত হও। আপনি বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন"। (সূরা হজ্জঃ ৩৪)

## ১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। আকীদা, ইবাদত, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্র নীতি এবং শিক্ষাসহ মানব জীবনের সবকিছু এই ধর্মের ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। ইস লাম ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে ইসলামকে (চির কালের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। (সূরা মায়েদা : ৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

হে মু'মিনগণ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ ক রো না। নিশ্চিত জেন, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাকারা : ২০৮)

সুতরাং কুরআন-

সুন্নায় মানব জীবনের সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং বিধিবিধান রয়েছে। ফেকা হ শাস্ত্রে খুটিনাটি সব কিছুর বিস্তারিত আলোচনা আছে। এর কিছু মান্য করা, কিছুকে অস্বীকার করা কুফরী। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. البقرة

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ এবং কিছু অংশ অস্বীকার কর? তাহলে বল, যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি এছাড়া আর কী হতে পারে যে, পার্থিব জীবনে তা দের জন্য থাকবে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠিনত র আযাবের দিকে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন। (বাকারা : ৮৫)

ইসলাম-

পূর্ব আসমানী ধর্মগুলো সারা পৃথিবীর জন্য এবং সব যুগের জন্য ছিলো না। তাই বর্ত

মান প্রেক্ষাপটে সেগুলোতে জীবনের সকল বিষয়ের সমাধান নেই এবং সেগুলো পূর্ণা ঙ্গ নয়। কিন্তু ইসলাম এর ব্যতিক্রম।

**২. ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন**

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ দ্বীন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি এক মাত্র এ ধর্মের মাঝে নিহিত। এরশাদ হয়েছে:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন কেবল ইসলাম। (আলে ইমরান: ১৯)
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও দ্বীন অবলম্বন করতে চাবে, তার থেকে সে দ্বীন ক বুল করা হবে না এবং আখেরাতে যারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।
(আলে ইমরান: ৮৫)
হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে:

عن جابر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال وفيه، ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعى ،رواه احمد فى مسنده جـ٤ رقم ١٤٧٣٦ و البيهقى فى شعب الايمان جـ ١باب في الإيمان بالقرآن و سائر الكتب المنـزله رقم١٧٦

যদি মুসা আ. জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁকেও আমার অনুসরণ করতে হত।
(মুসনাদে আহমদ, হাদীস, ১৪৭৩৬ শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ১৭৬)

**৩. ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম, সকল মানুষের ধর্ম**

আল্লাহ পাক বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, বিশ্বমানবের জন্য যা আদ্যোপান্ত হেদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চুড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়।
(বাকার : ১৮৫)

## ইসলামি শরিয়ার পরিচয়

শরিয়া একটি পরিভাষা। শরিয়া মানেই কুরআন-সুন্নাহর আইন ও বিধান।
আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা. দীন পালনে যেসব আইন-বিধান, নিয়ম-পদ্ধতি, হালাল-হারাম, সময় সীমা এবং বৈধ অবৈধের সীমারেখা প্রদান করেছেন সেগুলো এবং সেগুলোর মূলনীতির সমন্বিত রূপই ইসলামি শরিয়া।
ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামকে আল কুরআনে বলা হয়েছে 'দীন':
إِن ◌َ◌ّالدِّين ◌َعِند ◌َالله ◌ِالْإِسْلَام. ◌ُ
অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দীন হলো ইসলাম।' (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৯)
الْيَوْم ◌َأَكْمَلْت ◌ُلَكُم ◌ْدِينَكُم ◌ْوَأَتْمَمْت ◌ُعَلَيْكُم ◌ْنِعْمَتِي وَرَضِيت ◌ُلَكُم ◌ُ
الْإِسْلَام ◌َدِينًا.
অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ (Perfect) করে দিলাম তোমাদের দীন, তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ (complete) করে দিলাম আমার অনুগ্রহ (অহি) এবং তোমাদের জন্যে দীন মনোনীত করলাম ইসলামকে।
(সূরা মায়িদা:আয়াত ৩)

দীন মানে- সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগি ভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থা, জীবন- বিধান; আনুগত্যের বিধান, জীবন যাপন পদ্ধতি। দীনের মধ্যেই আল্লাহ শরিয়া দিয়েছেন। মহান আল্লাহ দীনের মধ্যে তাঁর আনুগত্য করার পদ্ধতি, নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান প্রদান করেছেন। আদেশ নিষেধ জারি করেছেন। অনেক বিষয় বৈধ ও হালাল

করেছেন, আবার কিছু কিছু জিনিস হারাম ও অবৈধ করেছেন। অনেক ব্যাপারে সময় ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।-
এই বিষয়গুলো হলো শরিয়া।

## দীন ও শরিয়া

ইসলামের উপমা হলো একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর বৃক্ষ। এর মূল, শিকড় ও কান্ড হলো 'দীন'। এর শাখা প্রশাখা, পত্র পল্লব, ফুল ফল হলো 'শরিয়া'। অথবা
ইসলামের উদাহরণ হলো একটি ইমারত। এর ভিত, পিলার এবং ছাদ হলো দীন। এর নকশা, মাপ, অনুমোদনপত্র, পানি বিদ্যুত গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা, বেসিন, টয়লেট, গোসলখানা, স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা, রান্নাঘর, খাবার কক্ষ, বৈঠকখানা, বেডরুম এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ও নিয়মাবলী হলো শরিয়া।
আবুল আ'লা মওদূদী বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এভাবে:
Deen stands for Belief and Faith. Submission to Allah by obeying His Orders and Commands and by following His Prophet. Shariah means: The detailed code of conduct or the canons comprising ways and modes of worship, standers of morals and life and laws that allow and prescribe, that judge between right ১ and wrong.
আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি: আল্লাহ্র আনুগত্য করা বা নির্দেশ পালন করা হচ্ছে 'দীন'। সময় মতো সালাত আদায় করা বা নামায পড়া আল্লাহর একটি নির্দেশ। সুতরাং যিনি সালাত আদায় করলেন তিনি দীন পালন করলেন।
কিন্তু সালাত আদায় করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে এবং তাঁর রসূলের মাধ্যমে কিছু বিধি নিষেধ, নিয়ম পদ্ধতি এবং সময় ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন- সময় হওয়া, সময়ের সীমারেখা অতিক্রম না করা, পবিত্র হওয়া, অযু করা, কেবলামুখি হওয়া, কুরআন পাঠ করা, রুকু করা, সাজদা করা, দাঁড়ানো, বসা, বিভিন্ন তসবিহ ও দোয়া পাঠ করা, সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা। তাছাড়া সালাতের মধ্যে অন্য কোনো কাজ না করা, কথাবার্তা না বলা, এদিক সেদিক না তাকানো, করা হে পাশ। শশম শুতো শাশাত পাগাম কমা মা শাখামাড়া

আল্লাহ্ একটি নির্দেশ। সুতরাং যিনি সালাত আদায় করলেন তিনি দীন পালন করলেন।

কিন্তু সালাত আদায় করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা আল কুরআনে এবং তাঁর রসূলের মাধ্যমে কিছু বিধি নিষেধ, নিয়ম পদ্ধতি এবং সময় ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন- সময় হওয়া, সময়ের সীমারেখা অতিক্রম না করা, পবিত্র হওয়া, অযু করা, কেবলামুখি হওয়া, কুরআন পাঠ করা, রুকু করা, সাজদা করা, দাঁড়ানো, বসা, বিভিন্ন তসবিহ ও দোয়া পাঠ করা, সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা। তাছাড়া সালাতের মধ্যে অন্য কোনো কাজ না করা, কথাবার্তা না বলা, এদিক সেদিক না তাকানো, ধারাবাহিকতা লংঘন না করা, অযু ভঙ্গ না করা। এ জিনিসগুলো অর্থাৎ এসব বিধিবিধান, নিয়মকানুন, করণীয়, বর্জনীয়, সময়, সীমারেখা ও ধারবাহিকতা পালন করাটাই শরিয়া।

দীন যেমন নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত, একইভাবে শরিয়াও নবীর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত। দীন এবং শরিয়ার পূর্ণ রূপই হলো ইসলাম।

কুরআন বলছে, সকল নবীকে একই শাশ্বত দীন প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু নবীদের ভিন্ন ভিন্ন শরিয়া প্রদান করা হয়েছে:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى * أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

অর্থ: তিনি তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন সেই দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন ইবরাহিম, মূসা এবং ঈসাকে। তিনি সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন: তোমরা এই দীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে ফেরকা সৃষ্টি করোনা।

(সূরা ৪২ আশ শূরা: আয়াত ১৩)

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে অতীতের নবীগণকে প্রদত্ত সকল শরিয়া রহিত করে মহান আল্লাহ সকল মানুষের জন্যে একটি মাত্র শরিয়া প্রদান করেছেন। সেটাই হলো 'ইসলামি শরিয়া'। আল কুরআন পরিষ্কার করে বলছে:

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ.

অর্থ: আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একটি ইবাদত-পদ্ধতি (শরিয়া) দিয়েছিলাম, তারা সেটার অনুসরণ করতো।

(সূরা ২২ আল হজ্জ: আয়াত ৬৭)

অতপর দীনের অনুসরণের জন্যে মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ সা.-কে একটি পৃথক শরিয়া প্রদান করেন।

তিনি বলেন:

ثُم َّ َجَعَلْنَاك َعَلَى شَرِيعَة ٍمِّن َالْأَمْر ِفَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِع ُأَهْوَاءَ الَّذِين َلَا يَعْلَمُون. َ

অর্থ: অতপর (হে মুহাম্মদ!) আমি তোমাকে অনুশাসন (commandment)- এর একটি বিশেষ শরিয়ার (পন্থা পদ্ধতির) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি এরই অনুসরণ করো এবং যারা জানেনা, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা।
(সূরা ৪৫: আল জাসিয়া: আয়াত ১৮)

## শরিয়া প্রণেতা কে?

ইসলামি শরিয়া মূলত আল্লাহ প্রদত্ত। আর যেহেতু আল্লাহ তায়ালা দীন ও শরিয়া নাযিল করেছেন আখেরি নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর প্রতি, তাই তিনি তাঁকে দীন ও শরিয়ার ব্যাখ্যাতা এবং মানুষের মাঝে ফায়সালাকারীও নিযুক্ত করেছেন। এভাবে তিনি রসূল সা.-কেও শরিয়া প্রণয়নের এখতিয়ার দিয়েছেন। তাই তিনি শরিয়ার যে ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন এবং যে ফায়সালাই দিয়েছেন তা মূলত আল্লাহর নির্দেশনা মাফিকই দিয়েছেন:

وَمَا كَان َلِمُؤْمِن ٍوَلَا مُؤْمِنَة ٍإِذَا قَضَى اللَّه ُوَرَسُولُه ُأَمْرًا أَن يَكُون َلَهُم ُالْخِيَرَة ُ مِن ْأَمْرِهِم. ْ

অর্থ: আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে নির্দেশ/ফায়সালা (decree) প্রদান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই। (সূরা ৩৩ আহযাব: আয়াত ৩৬)

فَلَا وَرَبِّك َلَا يُؤْمِنُون َحَتَّى يُحَكِّمُوك َفِيمَا شَجَر َبَيْنَهُم ْثُم َّ َلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم ْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْت َوَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ: না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা ততোক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবেনা, যতোক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদ ও সমস্যাসমূহের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ করে;

অতপর তোমার ফায়সালা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং নিশ্চিন্ত মনে তা মেনে নেয়। (সূরা ৪ আন নিসা: ৬৫)

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

অর্থ: তিনি (মুহাম্মদ) নিজের খুশিমতো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা হলো অহি, যা তার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়। (সূরা ৫৩ আন নজম:
আয়াত ৩-৪)

শরিয়ার উৎস কি?

দীন যেমন রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত, তেমনি শরিয়াও রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত। সুতরাং ইসলামি শরিয়ার উৎস মূলত দুটি:

১. আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং

২. আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর সুন্নাহ।

এ দুটিই ইসলামি শরিয়ার উৎস। ইসলামি শরিয়ার বিধি-বিধান কুরআনেই প্রদান করা হয়েছে। কুরআন শরিয়ার মূলনীতি দিয়েছে এবং বিধি- বিধান দিয়েছে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বিস্তারিতভাবে। কুরআন প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে রসূলের উপর। সুতরাং রসূলের সুন্নাহও ইসলামি শরিয়ার উৎস। আল্লাহ বলেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوْا

অর্থ: রসূল তোমাদের যা প্রদান করে তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা ৫৯ হাশর: আয়াত ৭)

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে যদি মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে তা (মীমাংসার জন্যে) রুজু (refer) করো আল্লাহ এবং রসূলের নিকট।
(সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৫৯)

রসূল সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

অর্থ: আমি তোমাদের জন্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোদিন তোমরা এদুটোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততোদিন কিছুতেই বিপথগামী হবেনা। সেগুলো হলো: ১. আল্লাহর কিতাব এবং ২. তাঁর রসূলের সুন্নাহ।

(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযি)

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আইন প্রণয়নের জন্যে আরেকটি উৎসের ইংগিত পাওয়া যায় আল কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে। সেটির নাম ইজতিহাদ। অবশ্য কোনো কোনো উসূলবিদ (আইনের মূলনীতি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ) ইজতিহাদের স্থলে কিয়াসকে এই তৃতীয় উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

যারা কিয়াসের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁরা মনে করেন কিয়াস করার জন্যে ইজতিহাদের প্রয়োজন।আর যারা ইজতিহাদকে এই তৃতীয় উৎস বলেছেন, তাঁরা বলেছেন, মূলত মুজতাহিদই (ইজতিহাদকারী) কিয়াস এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় বিধান নির্ণয়, উদ্ভাবন ও প্রণয়ন করেন।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উসূল (শরিয়ার বিধান নির্ণয়ের মূলনীতি) গ্রন্থ রচনাকারী ইমাম শাফেয়ী বলেন:

كُل مَا نَزَل بِمُسْلِم فَفِيْه حُكْم لَأَزِم وَعَلَيْه إِذَا كَان بِعَيْنِه اتَّبَاعه وَإِذَا لَم يَكُن فِيْه بِعَيْنِه طَلَب الدَّلِيل عَلَى
سَبِيل الْحَق بِالاجْتِهَاد وَالاجْتِهَاد هُو الْقِيَاس.

অর্থ: মুসলিমের জন্যে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা অপরিহার্য হুকুম ও বিধান। হুকুম যখন সুস্পষ্ট ও অকাট্য হয় তখন তাকে তা পালন করতে হবে। আর যেসব হুকুম সুস্পষ্ট নয়, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, সেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক যুক্তি প্রমাণ অনুসন্ধান করতে হবে আর ইজতিহাদই কিয়াস।

প্রকৃতপক্ষে এই তৃতীয় উৎসটি ইজতিহাদই। আর ইজতিহাদ দ্বারা প্রণীত আইন বা বিধান অবশ্যি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। কুরআন সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা বাতিল। অর্থাৎ এটি

ইজতিহাদই কিয়াস।'

প্রকৃতপক্ষে এই তৃতীয় উৎসটি ইজতিহাদই। আর ইজতিহাদ দ্বারা প্রণীত আইন বা বিধান অবশ্যি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। কুরআন সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা বাতিল। অর্থাৎ এটি শর্ত সাপেক্ষ উৎস।

এ প্রসঙ্গে সারকথা হলো, কুরআন এবং সুন্নাহ্ই ইসলামি শরিয়ার মূল উৎস। ইজতিহাদি মত কুরআন সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত হলেই কেবল আইনের মর্যাদা লাভ করবে।

ইজতিহাদ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে সম্মুখে আলোচনা আসছে।

## 1.আল কুরআন

শরিয়ার মূল এবং প্রথম উৎস আল কুরআন। এটি আল্লাহর কিতাব। আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। এটির ভাষা এবং বক্তব্য দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত। এ কিতাব অক্ষরে অক্ষরে সুসংরক্ষিত। এতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। এ মহাগ্রন্থ্ আল্লাহর নির্ভুল কিতাব, এর ভাষা নির্ভুল, এর বিধান নির্ভুল, এর উদ্দেশ্য মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ, এর উপযোগীতা এর বিধান নির্ভুল, এর উদ্দেশ্য মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ, এর উপযোগীতা সার্বজনীন, এর সত্যতা সকল চ্যালেঞ্জের উর্ধে, এর কার্যকারিতা চিরন্তন শাশ্বত, এর সুফল অনিবার্য।

এ কিতাব সকল সত্যজ্ঞানের অনাবিল ফল্গুধারা। এর ভাষা, বক্তব্য ও বিধানের অনুরূপ রচনা করতে সর্বকালের সকল মানুষ সম্পূর্ণ অক্ষম অসহায় অপারগ।

এ মহাগ্রন্থের বিপরীতে সত্য, বাস্তবতা ও কল্যাণ অনুপস্থিত। এ মহাগ্রন্থের অস্বীকৃতি ও অপ্রয়োগ মানে অকল্যাণের অনিবার্য উপস্থিতি।

এ কিতাব সবচেয়ে খাঁটি, সঠিক, বাস্তব, নির্ভুল ও সুষম পথ দেখায়:

إِن َّ هَذَا الْقُرْآن َيَهْدِي لِلَّتِي هِي َأَقْوَمُ

অর্থ: নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা সবচেয়ে খাঁটি সঠিক ও সুষম।
(আল কুরআন সূরা ১৭ ইসরা:আয়াত০৯)

## 2. আস্ সুন্নাহ

সুন্নাহ্ ইসলামি শরিয়ার দ্বিতীয় উৎস। সুন্নাহ্ হলো আল কুরআনের বাহক- যাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে তাঁর অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.- এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে প্রদত্ত দীন ও শরিয়ার তত্ত্ব, তথ্য ও বিধি বিধান।

রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর হাদিসের ভান্ডারে। বিশেষ বিবেচনায় ব্যাপক হাদিস সংকলন বিলম্বিত হয় প্রায় শত বৎসর। এ দীর্ঘ সময় সাহাবি, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণ হাদিস শিক্ষা, প্রচার ও সংরক্ষণের জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় নির্ভুলভাবে হাদিস সংরক্ষিত হতে থাকে। পরবর্তীতে ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সকল হাদিস লিপিবদ্ধ করে ফেলা হয়।

সুন্নাহ কুরআন নয়, তবে কুরআনের প্রতিবিম্ব। কুরআন হলো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র প্রতি অবতীর্ণ ভাষা ও মর্ম সম্বলিত আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ অহি। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. হলেন বাস্তব কুরআন।

- তিনি কুরআনের ব্যাখ্যাতা। তাঁর ব্যাখ্যাই কুরআনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা।
- তিনি কুরআনের বিধান বাস্তবায়নকারী। তিনি যে পন্থা প্রক্রিয়া ও নিয়ম পদ্ধতিতে বিধান বা কুরআনের হুকুম আহকাম বাস্তবায়ন করেছেন, সেটাই তা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পদ্ধতি।
- তাছাড়া কুরআনে উল্লেখ নেই এমন অনেক বিষয়েই তাঁকে দিক নির্দেশনা দিতে হয়েছে, ফায়সালা দিতে হয়েছে, নিয়ম বিধান দিতে হয়েছে। সেগুলোও তিনি আল্লাহ্র ইশারার ভিত্তিতেই করেছেন, অথবা সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত।

এসবই তাঁর সুন্নাহ। আল্লাহ তাঁর প্রতি যে জীবন বিধান নাযিল করেছেন,
এসবই তার ব্যাখ্যা বা বাস্তব রূপ। আল কুরআন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের একমাত্র অনুমোদিত ব্যাখ্যাতা তিনিই:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ: আর আমরা তোমার প্রতি আয যিক্‌ (আল কুরআন) নাযিল করেছি, যাত করে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও- যা তাদের জন্যে নাযিল করা হয়েছে। (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত 88)

সুন্নাহ ছাড়া ইসলাম পালন করাই অসম্ভব। যেমন: কুরআন মজিদে নামায পড়তে বা কায়েম করতে বলা হয়েছে। নামাযের সময়ের ব্যাখ্যাসাপেক্ষ নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে এবং রুকু ও সাজদা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এতোটুকুতেই নামায আদায় করা সম্ভব নয়। নামাযের ওয়াক্তের শুরু এবং শেষ, তকবির বলে শুরু করা, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা, একটি রুকু করা, দুইটি সাজদা করা, ফজর নামায

দুই রাকাত পড়া, যুহর চার রাকাত, আছর চার রাকাত, মাগরিব তিন রাকাত এবং এশা চার রাকাত পড়া, আত্তাহিয়্যাতু পড়া, দরূদ পড়া, সালাম বলে নামায শেষ করা- এসবই জানা যায় সুন্নাহ থেকে। এগুলো কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি।
এভাবে সকল বিষয়েই মৌলিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কুরআনে এবং ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত রূপ দেয়া হয়েছে সুন্নায়। সুতরাং সুন্নাহ ছাড়া দীন ও শরিয়া পালন করা সম্ভব নয়। সুন্নাহ্ কুরআনেরই ব্যাখ্যা এবং বাস্তব রূপ।
আল কুরআনের উল্লেখিত অকাট্য আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, ইসলামি শরিয়া তথা ইসলামি আইন ও বিধানের উৎস হলো আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা.-এর সুন্নাহ।

## 3.ইজতিহাদ

ইজতিহাদ আরবি শব্দ এবং ইসলামি শরিয়ার একটি পরিভাষা। اجْتِهَاد শব্দের শব্দমূল হলো جَهْد জাহ্দুন বা جُهْد জুহদুন। এর অর্থ চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানো, চূড়ান্ত সাধনা করা, সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা চালানো।
উসূলবিগণের পরিভাষায়: 'ইজতিহাদ হলো কুরআন ও সুন্নায় পাওয়া যায়না এমন বিষয়ের শরয়ী বিধান উদ্ভাবনের জন্যে কোনো মুজতাহিদ বা ফকিহ্ কর্তৃক নিষ্ঠার সাথে নিজের সমস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সর্বাত্মক চিন্তা গবেষণায় নিয়োজিত করা।
কাযী বায়দাবি ইজতিহাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

هُو اسْتِفْرَاغ الْجُهْد فِي دَرْك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة

'ইজতিহাদ হলো শরয়ী বিধান জানা ও অবগত হওয়ার জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা।" ইমাম মুহাম্মদ আবুয যুহ্রা ইজতিহাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ফকিহদের মতে ইজতিহাদ হলো:

الْاِجْتِهَاد بَذْل الْفَقِيْه وُسْعَه فِي اسْتِنْبَاط الأَحْكَام العَمَلِيُّه مِنْ
ادِلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّة

অর্থ: বিস্তারিত যুক্তি ও প্রমাণসহ বাস্তব কর্ম ও আচরণের বিধান নির্ণয়ে ফকিহ্র সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোকে ইজতিহাদ বলা হয়।
ইমাম আবু যুহ্রা আরো বলেন:

الاجْتِهَاد ُبَذْل َالْفَقِيْه ِوُسْعَه فِي اسْتِنْبَاط ِالْأَحْكَام ِالعَمَلِيُّه ِمِنْ ادِلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّة

অর্থ: বিস্তারিত যুক্তি ও প্রমাণসহ বাস্তব কর্ম ও আচরণের বিধান নির্ণয়ে ফকিহ্র সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোকে ইজতিহাদ বলা হয়।

ইমাম আবু যুহ্রা আরো বলেন:

الاجْتِهَاد ُفِي اِصْطِلَاح ِالأَصُولِين َبِأَنَّه ُاسْتِفْرَاغ ُالْجُهْد ِوَبَذْل ُغَايَة ِالْوُسْع ِإِمَّا فِي اسْتِنْبَاط ِالْأَحْكَام ِالشَّرْعِيَّة ِوَإِمَّا فِي تَطْبِيقِهَا.

অর্থ: উসূলবিদদের দৃষ্টিতে ইজতিহাদ হলো: শরিয়তের বিধান নির্ণয় করা, কিংবা বিরোধের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান করার কাজে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও সর্বাত্মক সাধনায় আত্মনিয়োগ করা।'

**ইজতিহাদের আভিধানিক অর্থ হলো:** কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করা।

আর **পারিভাষিক অর্থ হলো:** কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ইসলামের বিধান বা উদ্দেশ্য জানার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা করা।

যিনি যোগ্যতার অধিকারী হয়ে ইজতিহাদ করেন, তাকে মুজতাহিদ বলা হয়।

ইসলাম একটি জীবন্ত গতিশীল জীবন-বিধান। মানুষের জীবন যাপন এবং জীবনের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে এ বিধানে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা কিংবা স্থবিরতা নেই। কারণ, ইসলাম হলো মানুষের গ্রষ্টার প্রদত্ত বিধান। এ বিধান সর্বযুগে সর্বাধুনিক হবার কারণ হলো: 'সৃষ্টি যার বিধান তার'। এ বিধান সম্পর্কে কুরআন বলে দিয়েছে:

أَلَا لَه ُالْخَلْق ُوَالْأَمْر ُتَبَارَك َالله ُرَب ُّالْعَالَمِينَ

অর্থ: জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁরই। আল্লাহ মহাজগতের মহা কল্যাণময় প্রভু। (সূরা ৭ আল আ'রাফ: আয়াত ৫৪)

আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ার একটি প্রশস্ত ও কল্যাণময় দিক হলো, মানব জীবনে যখনই কোনো নতুন বিষয় দেখা দেয় এবং নতুন কোনো সমস্যার উদ্ভব ঘটে, সে বিষয়ে কুরআন এবং সুন্নায় যদি কোনো বিধান বা দিক নির্দেশনা পাওয়া না যায়, তখন সেক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ্র মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (এবং সাংঘর্ষিক নয়) এবং মানুষের জন্যে কল্যাণকর (ক্ষতিকর নয়) কোনো প্রচলিত মত বা গবেষণালব্ধ মত,

কিংবা বিজ্ঞজনদের সমর্থিত মত বা প্রথা, বা দৃষ্টান্ত অথবা কল্যাণকর কোনো নিয়ম-রীতি গ্রহণ করার অবকাশ ইসলামি শরিয়া প্রদান করেছে।

ইসলামি ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী ইজতিহাদের মাধ্যমে উপরোল্লেখিত বিভিন্ন পন্থায় যেসব বিধি নির্ণয় করা হবে সেগুলো শর্তসাপেক্ষে 'শরিয়া বিধি' হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

মানুষের জন্যে কল্যাণকর (ক্ষতিকর নয়) কোনো প্রচলিত মত বা গবেষণালব্ধ মত, কিংবা বিজ্ঞজনদের সমর্থিত মত বা প্রথা, বা দৃষ্টান্ত অথবা কল্যাণকর কোনো নিয়ম-রীতি গ্রহণ করার অবকাশ ইসলামি শরিয়া প্রদান করেছে।

ইসলামি ফিকহের মূলনীতি অনুযায়ী ইজতিহাদের মাধ্যমে উপরোল্লেখিত বিভিন্ন পন্থায় যেসব বিধি নির্ণয় করা হবে সেগুলো শর্তসাপেক্ষে 'শরিয়া বিধি' হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

এ ধরণের মত, গবেষণালব্ধ মত, ঐক্যমত, দৃষ্টান্ত, প্রথা, প্রচলন শরিয়া আইনে গ্রহণযোগ্য হবার জন্যে দুইটি মৌলিক শর্ত পূরণ হওয়া অপরিহার্য:

১. যেসব ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নায় বিধি বর্তমান নেই, কেবল সেসব ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য হবে।

২. কুরআন সুন্নায় বিধৃত কোনো বিধি এবং কুরআন সুন্নাহ্র স্পীরিটের সাথেও সাংঘর্ষিক হতে পারবেনা।

এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ইজমা এবং মতামতের সাথেও সাংঘর্ষিক হতে পারবেনা।

ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ ধরণের কোনো মত বা রীতিনীতির বিষয়ে যদি কুরআন বা সুন্নায় কোনো ফায়সালা না থাকে এবং এসব

মত বা দৃষ্টান্ত, বা রীতিনীতি যদি কুরআন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে এগুলোর মর্যাদা হলো, এগুলো শরিয়া অনুমোদিত ও সমর্থিত বিধান বলে গণ্য হবে।

তবে এগুলোর ক্ষেত্রে মতভেদ দোষনীয় নয়। উত্তম ও কল্যাণকর মতই গ্রহণযোগ্য।

# ইজতিহাদের নির্দেশনা ও সূচনা

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদেই রসূল সা.-কে ইজতিহাদ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং তিনি সাহাবায়ে কিরামকে ইজতিহাদ করার দায়িত্ব অর্পন করেছেন। রসূল সা. নিজে ইজতিহাদ করেছেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে ইজতিহাদ করতে উৎসাহিত করেছেন। রসূলুল্লাহ সা.-এর ইজতিহাদ আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন প্রদান করতেন। কখনো তাঁর কোনো ইজতিহাদি ভুল হলে আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে তা সংশোধন করে দিতেন।

আল কুরআন জ্ঞানী লোকদের ইজতিহাদের অনুমতি দিয়েছে। নিেক্ত আয়াতগুলো তার দলিল:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: সুতরাং তোমরা না জানলে (কিতাবের) জ্ঞানধারীদের জিজ্ঞাসা করো। (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৪৩, সূরা ২১ আল আম্বিয়া: আয়াত ৭)

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

অর্থ: তারা যদি বিষয়টি আল্লাহ্র রসূলের এবং তাদের দায়িত্বশীলদের গোচরে নিতো, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্যানুসন্ধান করে, তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারতো। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৮৩)

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

অর্থ: তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।
(সূরা ৪২ আশ্ শূরা: আয়াত ৩৮)

আয়াতগুলো জ্ঞানী ও দায়িত্বশীলদের ইজতিহাদ করার অনুমতি প্রদান করে।

রসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ থেকেও জ্ঞানী ও দায়িত্বশীল লোকদের ইজতিহাদ করার অনুমতি ও উৎসাহ পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো:

১. রসূলুল্লাহ সা. মুয়ায রা. কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার কালে তার কাছে জানতে চইলেন: কোনো বিষয় (ফায়সালার জন্যে) তোমার কাছে উপস্থাপন করা হলে তুমি কী করবে?' মুয়ায বললেন: 'আমি তা ফায়সালা করবো

আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী।' রসূল জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি যদি আল্লাহ্ কিতাবে কোনো সমাধান না পাও সেক্ষেত্রে কী করবে?' মুয়ায বললেন: 'তখন আমি আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করবো।' রসূলুল্লাহ সা. জানতে চাইলেন: 'রসূলের সুন্নাহতেও যদি কোনো সমাধান না পাও, সেক্ষেত্রে কী করবে?' মুয়ায বললেন: ' সেক্ষেত্রে আমি নিজেই ইজতিহাদ করে ফায়সালা করবো।' তখন রসূলুল্লাহ সা. মুয়াযের বুক চাপড়ে দিয়ে বললেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্, যিনি তাঁর রসূলের দূতকে/ প্রতিনিধিকে এমন হিদায়াত দান করেছেন যা তাঁকে এবং তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করেছে।' (সুনানে আবু দাউদ: বিচার ফায়সালা অধ্যায়)

২. সহীহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, খন্দক অর্থাৎ আহযাবের যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে রসূলুল্লাহ সা. সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন (মদিনা সনদ লংঘনকারী) ইহুদি গোষ্ঠী বনি কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। পথিমধ্যেই তিনি সাহাবীদের বনি কুরাইযার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে বললেন। তিনি বললেন: 'তোমরা বনি কুরাইযায় পৌঁছার আগে আসর নামায পড়বেনা।' সাহাবীগণ রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে আস্র নামাযের সময় উপস্থিত হলো একদল সাহাবী বললেন: 'আমরা এখানেই আস্র নামায পড়বো'। আরকেদল সাহাবী বললেন: 'নামাযের সময় চলে গেলেও রসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশমতো আমরা বনি কুরাইযায় না পৌঁছে আস্র নামায পড়বোনা।' সুতরাং একদল সাহাবী সময়মতো পথিমধ্যে আস্র নামায পড়ে নিলেন এবং আরেকদল সাহাবী নামাযের সময় পার হয়ে যাওয়ার পর বনি কুরাইযায় গিয়ে আস্র নামায পড়লেন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি যদি আল্লাহ্ কিতাবে কোনো সমাধান না পাও সেক্ষেত্রে কী করবে?' মুয়ায বললেন: 'তখন আমি আল্লাহর রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী ফায়সালা করবো।' রসূলুল্লাহ সা. জানতে চাইলেন: 'রসূলের সুন্নাহতেও যদি কোনো সমাধান না পাও, সেক্ষেত্রে কী করবে?'

মুয়ায বললেন: ' সেক্ষেত্রে আমি নিজেই ইজতিহাদ করে ফায়সালা করবো।' তখন রসূলুল্লাহ সা. মুয়াযের বুক চাপড়ে দিয়ে বললেন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্, যিনি তাঁর রসূলের দূতকে/ প্রতিনিধিকে এমন হিদায়াত দান করেছেন যা তাঁকে এবং তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করেছে।' (সুনানে আবু দাউদ: বিচার ফায়সালা অধ্যায়)

এসব উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্ত থেকে কতিপয় বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেলো। আমরা জানতে পারলাম:

১. কুরআন মজিদে ইজতিহাদের বিষয়ে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে।

২. উদ্ধৃত প্রথম হাদিস থেকে জানা গেলো আল কুরআন এবং সুন্নায় ফায়সালা পাওয়া না গেলে ইজতিহাদ করার মধ্যেই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। ইজতিহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করায় রসূলুল্লাহ সা. মুয়াযকে উৎসাহিত ও অভিনন্দিত করেছেন।

৩. উদ্ধৃত দ্বিতীয় হাদিসটি হলো বনি কুরাইযায় গিয়ে নামায পড়া সংক্রান্ত। এখানে বনি কুরাইযায় না পৌঁছে আস্র নামায না পড়ার নির্দেশ ছিলো। কিন্তু এই নির্দেশ বাস্তবায়নে সাহাবীগণ দুই রকম আমল করেছেন।

একদল সাহাবী রসূলুল্লাহ সা.-এর আদেশ বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে হুবহু পালন করেন এবং আস্র নামাযের সময় চলে যাওয়া সত্ত্বেও বনি কুরাইযায় না পৌঁছে পথে নামায পড়েননি।

৪. সাহাবীগণের অপর দল রসূল সা.-এর নির্দেশের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করে নির্দেশের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করেন। ফলে তাঁরা মনে করেন: 'রসূলুল্লাহ সা.-এর উদ্দেশ্য ছিলো বনু কুরাইযায় পৌঁছা তরান্বিত করা

এভাবে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই ইজতিহাদের সূচনা হয়। তিনি ইজতিহাদকে উৎসাহিত করেন এবং সাহাবীগণের ইজতিহাদ অনুমোদন করেন।

সকল পর্যায়ের ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মুজাতাহিদকে মনে রাখতে হবে শরিয়ার উৎস হচ্ছে আল কুরআন এবং সুন্নাহ। তাই যে কোনো প্রক্রিয়ার ইজতিহাদি আইন অবশ্যি -

১. আইনের উৎস (আল কুরআন ও সুন্নাহ) থেকে গৃহীত হতে হবে, অথবা

২. আইনের উৎস দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, অথবা

৩. আইনের উৎস কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

এই বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে স্বাধীন ইজতিহাদ করা হলে, তা ইসলামি আইন বলে গণ্য হবেনা।

## মাকাসিদে শরিয়া (objectives of shariah)

মাকাসিদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন মাকসাদ। মাকসাদ মানে- উদ্দেশ্য (objective)। ইসলামের ভিত্তিতে জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই একমাত্র মানব কল্যাণের শরিয়া। মানুষের ইহ জাগতিক এবং পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ শরিয়া প্রদান করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ্ আলোকে মাকাসিদে শরিয়া বা ইসলামি শরিয়ার উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

০১. ঈমান ও তাওহীদ: অর্থাৎ মুমিনের ঈমান ও আকিদা-বিশ্বাসের সংরক্ষণ।

০২. আদল: ন্যায় বিচার ও সুষমনীতি নিশ্চিত করণ।

০৩. ইহসান ও ফালাহে 'আম: মানবতার কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত করণ।

০৪. হায়াতে তাইয়্যেবা: সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন নিশ্চিত করণ।

০৫. মানবতার কল্যাণ, সাফল্য এবং সুন্দর-স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্যে

০৩. ইহসান ও ফালাহে 'আম: মানবতার কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত করণ।

০৪. হায়াতে তাইয়্যেবা: সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন নিশ্চিত করণ।

০৫. মানবতার কল্যাণ, সাফল্য এবং সুন্দর-স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

০৬. জীবনের নিরাপত্তা বিধান।

০৭. মানব বংশ সংরক্ষণ।

০৮. সম্পদের নিরাপত্তা।

০৯. মর্যাদা তথা মান সম্মান ও ইয্যতের নিরাপত্তা।

১০. মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ও বিকাশের সুবিধা নিশ্চিত করণ।

১১. চিন্তা, চলাফেরা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ।

১২. সামগ্রিক মানবাধিকার সংরক্ষণ।

## ইসলামি শরিয়ার বৈশিষ্ট্য

ইসলামি শরিয়া সর্বদিক থেকে অনন্য। এর অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. মহাবিশ্ব ও মানুষের মহান স্রষ্টা আল্লাহর শরিয়ত: অর্থাৎ এটি আল্লাহ প্রদত্ত এবং আল্লাহমুখী শরিয়াত।

২. বিশ্বমানবতাবাদী: এটি স্থান, কাল, পাত্র, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে প্রযোজ্য এবং সকলের উপযোগী।

৩. সার্বজনীন সুবিচার: এটি সমগ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সমানভাবে আদল, ইনসাফ ও সবিচার (Justice) প্রতিষ্ঠাকামী।

২. বিশ্বমানবতাবাদী: এটি স্থান, কাল, পাত্র, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে প্রযোজ্য এবং সকলের উপযোগী।

৩. সার্বজনীন সুবিচার: এটি সমগ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সমানভাবে আদল, ইনসাফ ও সুবিচার (Justice) প্রতিষ্ঠাকামী।

৪. ব্যক্তির ও সমষ্টির সমমূল্যায়ন: শরিয়া আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষের
মর্যাদা সমান। এখানে কোনো গোত্র, গোষ্ঠী বা বর্ণের উপর অপর কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বর্ণ ও গোত্রের প্রধান্য নেই।

৫. স্থায়ীত্ব এবং কঠোরতা ও কোমলতার সমন্বয়: ইসলামি শরিয়া তার
আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে যেমন কঠোর, তেমনি আইন প্রয়োগের ব্যাপারে কোমল এবং উদার। ফলে এটি সময়ের বিবর্তন এবং নতুন
নতুন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর এ কারণে এটি সময়ের ব্যবধানে তার অস্তিত্ব হারায় না, বরং সদা সমভাবে কার্যকর।"

ইসলামি শরিয়া ও মানবীয় আইনের পার্থক্য নিম্নরূপ:

নতুন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর এ কারণে এটি সময়ের ব্যবধানে তার অস্তিত্ব হারায় না, বরং সদা সমভাবে কার্যকর।"

ইসলামি শরিয়া ও মানবীয় আইনের পার্থক্য নিম্নরূপ:

| ইসলামি শরিয়া | মানবীয় আইন |
|---|---|
| আল্লাহ প্রদত্ত | রচিত মানব |
| উৎস: কুরআন ও সুন্নাহ | উৎস: সমাজও গোষ্ঠীর আচরণ |
| লক্ষ্য: দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ লাভ | পার্থিব ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা |
| উদ্দেশ্য: আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ গঠন | উদ্দেশ্য: প্রচলিত সমাজের প্রয়োজন পুরণ |
| সদা সর্বত্র উপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য | স্থান কাল পাত্র ভেদে উপযোগী |
| শাশ্বত, সার্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ | পরিবর্তনশীল, জাতি গোষ্ঠী শ্রেণীগত, অপূর্ণাঙ্গ |
| আল্লাহ্ আইনের কর্তৃত্ব | রাষ্ট্র/জনগণ/বিচারক/ শাসকের কর্তৃত্ব |
| অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্যশীল | অগ্রগতির সাথে পরিবর্তনশীল |
| বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া: আল্লাহভীতি> নৈতিক চেতনা > দন্ড | দন্ড |

# ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগক্ষেত্র সমূহ

ইসলামি শরিয়া মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত। সুতরাং শরিয়ার প্রয়োগ ক্ষেত্র মানুষের সামগ্রিক জীবন। মৌলিকভাবে ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগ ক্ষেত্র সমূহ হলো:

০১. ইবাদত।

০২. আনুগত্য।

০৩. অপরাধ।

০৪. ব্যক্তিগত জীবন।

০৫. পরিবার ও বংশ।

০৬. সামাজিক আচরণ ও পারস্পারিক সম্পর্ক।

০৭. সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র।

০৮. সামগ্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র।

০৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

১০. বিচার ফায়সালা।

# ইসলামি শরিয়ার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

ইসলামি শরিয়ার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে। সে কথাগুলো হলো:

১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে একদিকে যেমন হয়েছে ঈমানিয়াতের (অর্থাৎ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির) বিষয়সমূহ, তেমনি এতে রয়েছে আমল, ইবাদত ও মুয়ামালাতের (অর্থাৎ কর্ম, ইবাদত ও পারস্পরিক আচরণের) বিষয়াদি। এই শেষোক্ত বিষয়গুলোই শরিয়ার সাথে সম্পর্কিত।

২. সুতরাং প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিষয়টি শুধু শরিয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং বাস্তবায়নের বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামের সাথে সম্পর্কিত।

৩. ইসলাম বাস্তবায়নের বিষয়টি কারো খেয়াল খুশিমতো হবে না। এক্ষেত্রে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সা. কে। আল্লাহ্ তত্ত্বাবধানে তিনি যে প্রক্রিয়ায় দীন প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়ন করেছিলেন, সেটাই দীন প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবায়নের একমাত্র অনুমোদিত পন্থা।

এখন প্রশ্ন হলো, রসূলুল্লাহ সা. কী প্রক্রিয়ায় দীন ও শরিয়া বাস্তবায়ন করেছিলেন? তাঁর অবলম্বিত পন্থা পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তিনি পাঁচটি স্তরে দীন ও শরিয়া বাস্তবায়ন করেছিলেন। তাঁর অবলম্বিত পন্থার স্তরগুলো ছিলো নিম্নরূপ:

১. বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ও পুণর্গঠন: রসূলুল্লাহ সা. প্রথমেই
দাওয়াত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁর জনগণের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগিতে বিপ্লব সৃষ্টি করেন। তাদের জাহেলি বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করে দেন। আল কুরআন তথা অহির মাধ্যমে প্রাপ্ত ঈমানি বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগি দ্বারা তাদের চিন্তার পুণর্গঠন করেন।

২. জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তন ও পুণর্গঠন: জ্ঞান, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির
পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তিনি তাঁর লোকদের জীবনের মূল লক্ষ্য পরিবর্তন করে দেন। এতোদিন তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিলো, সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, অর্থ সম্পদে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং দেব-দেবীদের খুশি করা। এখন

তাদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এক সর্বশক্তিমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং অনন্ত পারলৌকিক জীবনে সাফল্য অর্জন করা।

৩ . নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন ও পুণর্গঠন: জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে তাঁর সাথিদের নীতি, নৈতিকতা ও চরিত্রের মানদণ্ডও সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। এতোদিন তারা ছাইকে সোনা ভাবতো। আর এখন তারা সোনাকে ছাইমুক্ত নিখাদ পাকা করার জন্য অগ্নিচুল্লিতে দগ্ধ হতেও দুনির্বার দুঃসাহসী হয়ে দাঁড়ায়।

৪. সামাজিক পরিবর্তন ও পুণর্গঠন: পরিবর্তিত বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি, জীবন লক্ষ্য আর নৈতিক চরিত্রের পবিত্র ফলগুধারায় তারা নিজেদের মধ্যে গোড়া পত্তন করেন এক নতুন সমাজের, তৈরি করেন পারস্পরিক সম্পর্কের নতুন মানবিক আবহ, আচরণের প্রীতিময় সুরভিত বাতায়ন, অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের নৈসর্গিক ধারা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ধারায় অনাবিল স্বচ্ছতা।

৫. রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ও পুণর্গঠন: অতপর প্রাণবন্ত সামাজিক শৃঙ্খলায় এবং আইন পালনের স্বগত উদ্দীপনায় উজ্জীবিত এই লোকদের নিয়ে যখন গঠন করা হলো মদিনা কেন্দ্রিক ইসলামি রাষ্ট্র, তখন আইন কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্রকে আইন জারি করা ছাড়া আর তেমন কোনো পদক্ষেপই নিতে হয়নি। প্রতিটি নাগরিক নিজেই আইনের সংরক্ষক হয়ে দাঁড়ায়।

শরিয়ার গুরুত্ব ও অখন্ডতা

ইসলামি শরিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনে ব্যাপক আলোচনা এসেছে। এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِل َإِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ْوَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِه ِأَوْلِيَاء َقَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُون. َ

اتَّبِعُوا مَا أُنزِل َإِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ْوَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِه ِأَوْلِيَاءَ

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُون. َ

অর্থ: তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা (যে বিধান) নাযিল করা হয়েছে তোমরা কেবল তারই অনুসরণ করো, তাঁকে ছাড়া অন্যদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়ে তাদের অনুসরণ করোনা। তবে তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। (সূরা ৭ আল আ'রাফ: আয়াত ৩)

وَمَا كَان َلِمُؤْمِن ٍوَلَا مُؤْمِنَة ٍإِذَا قَضَى اللَّه ُوَرَسُولُه ُأَمْرًا أَن يَكُونَ

لَهُم ُالْخِيَرَة ُمِن ْأَمْرِهِم. ْ

অর্থ: আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করেন, তখন আর সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নেই। (সূরা ৩৩ আল মায়িদা: আয়াত ৩৬)

وَمَن ْلَّم ْيَحْكُم بِمَا أَنزَل َاللَّه ُفَأُولَئِك َهُم ُالْكَافِرُون. َ

অর্থ: যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা তারা কাফির। (সূরা ৫ আল মায়িদা: আয়াত ৪৪)

শরিয়া ছাড়া ইসলাম পরিপালন করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন: নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিচার, অর্থনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে।

দীন ও শরিয়া তথা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের নির্দেশই আল কুরআনে দেয়া হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِين َآمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْم ِكَافَّة ًوَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَات ِالشَّيْطَان. ِ

Trans.: O ye who believe! Enter perfectly in Islam (by obeying all the rules and regulations of Islam); and follow not the footsteps of the Shaitan. (Al Quran 2: 206)

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ (perfect) জীবন বিধান। ইসলামি শরিয়া আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল আইন। আল্লাহ্ আইন পালনের ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে কোনো প্রকার ইচ্ছার স্বাধীনতা (freedom of choice) দেয়া হয়নি। ইচ্ছা মাফিক বা সুবিধা মাফিক কিছু অংশ পালন করার এবং কিছু অংশ পালন না করার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা কাউকেও দেননি। মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَتُؤْمِنُون َبِبَعْض ِالْكِتَاب ِوَتَكْفُرُون َبِبَعْض ، ٍفَمَا جَزَاء ُمَن يَفْعَل ُذَلِك َمِنكُم ْ
إِلَّا خِزْي ٌفِي الْحَيَاة ِالدُّنْيَا وَيَوْم َالْقِيَامَة ِيُرَدُّون َإِلَى أَشَر ِّالْعَذَاب ، ِوَمَا اللَّه ُ
بِغَافِل ٍعَمَّا تَعْمَلُون. َ

অর্থ: তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অমান্য করবে? তোমাদের মধ্যে যারাই এমনটি করবে তাদের একমাত্র পরিণাম হবে পৃথিবীর জীবনে হীনতা আর লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিনতম আযাবে। আল্লাহ তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অনবহিত নন। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ৮৫)

إن َّالَّذِين َيَكْتُمُون َمَا أَنزَلْنَا مِن َالْبَيِّنَات ِوَالْهُدَى مِن بَعْد ِمَا بَيَّنَّاه ُلِلنَّاس ُفِي الْكِتَاب ) ِأُولَئِك َيَلْعَنُهُم ُاللَّه ُوَيَلْعَنُهُم ُاللَّاعِنُون • َإِلَّا الَّذِين َتَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِك َأَتُوب ُعَلَيْهِم ْوَأَنَا التَّوَّاب ُالرَّحِيم. ُ

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আমার নাযিল করা প্রমান ও হিদায়াত (দীন ও শরিয়া) গোপন করে, আমি তা কিতাব আকারে মানব সমাজের জন্যে প্রকাশ করা পর, তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাদের অভিশাপ দেয় অভিশাপদানকারীরা। তবে অভিশাপ থেকে মুক্ত হয় তারা, যারা তওবা করে (অনুতপ্ত হয়), নিজেদের সংশোধন করে নেয় এবং মানুষের মাঝে সত্য প্রকাশ করে। আমি এদের তওবা কবুল করবো, কারণ আমি তওবা কবুলকারী দয়াময়। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৫৯-১৬০)

إن َّالَّذِين َيَكْفُرُون َبِاللَّه ِوَرُسُلِه ِوَيُرِيدُون َأَن يُفَرِّقُوا بَيْن َاللَّه ِوَرُسُلِه ِ وَيَقُولُون َنُؤْمِن ُبِبَعْض ٍوَنَكْفُر ُبِبَعْض ٍوَيُرِيدُون َأَن يَتَّخِذُوا بَيْن َذَلِك َسَبِيلًا . أُولَئِك َهُم ُالْكَافِرُون َحَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِين َعَذَابًا مُّهِينًا.

অর্থ: যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের অমান্য করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের (হুকুমের মধ্যে) পার্থক্য সৃষ্টি করে আর বলে: 'আমরা এগুলো মানবো এবং এগুলো মানবোনা'; তাছাড়া তারা মাঝামাঝি কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়; মূলত এরাই প্রকৃত কাফির। আর আল্লাহ এ ধরণের কাফিরদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন অপমানকর শাস্তি।

(সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ১৫০)

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম

ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ যদি কেউ করেন ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা, কাউকে কোনো ধর্মমত গ্রহণে বাধ্য না করা, তাহলে এ অর্থের সাথে ইসলামের কোনো সংঘাত নেই। কারণ ইসলাম জোরপূর্বক কাউকে ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে না। ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করার অধিকার রয়েছে। ইসলাম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায় বিচার ও সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে। এখানে অন্যায় পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই।

ইসলাম মুসলিম এমন জীবনব্যবস্থা, একমাত্র যার বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলার মতো ঔদার্য আছে। এ ধর্ম মতে, একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মাঝে সামাজিকতার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নেই।

কিন্তু ইসলাম যেহেতু পৃথক একটি ধর্ম। তাই আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতার স্তর ও সহযোগিতার ধরনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে।

ইসলাম অমুসলিমদের সব ক্ষেত্রে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। তাদের যথাযথ সম্মান দিয়েছে।

যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

## অমুসলিমদের সঙ্গে উঠাবসা

অমুসলিমদের সঙ্গে উঠাবসা করতে ইসলাম নিষেধ করে না। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ও উঠাবসা করা বৈধ। তবে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে না। এমনকি তাদের মসজিদে বসারও অনুমতি আছে।

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلُوا قُبَّةً كَانَتْ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ كُفَّارٌ، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَنْجُسُ» أَوْ نَحْوَ هَذَا

হযরত হাসান বলেন, যখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়, তখন তারা মসজিদের শেষ প্রান্তে অবস্থিত গম্বুজের কাছে অবস্থান করে। যখন নামাযের সময় হলো, দলের একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় হয়েছে অথচ এরা একদল অমুসলিম মসজিদে আছে। তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'অমুসলিমদের কারণে জমিন নাপাক হয় না।' **(**মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস : ৮৫৭৬,**৮৭৭৪]**

## অমুসলিমদের প্রতি জুলুম করা নিষিদ্ধ

নবী করীম (সা.) কারো ওপর জুলুম করতে নিষেধ করেছেন,যদিও মজলুম অমুসলিম হয় :

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ

হযরত আনাস বিন মালেক রাঃ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা মজলুমের বদদু'আ থেকে বেঁচে থেকো, যদিও সে কাফের হয়। তার মাঝখানে আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা নেই (অর্থাৎ তার বদদু'আ দ্রুত কবুল হয়ে যায়)।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২৫৭৭, ১২৫৪৯)

## অমুসলিমদের সঙ্গে ভালো কথাবার্তা

তাদের সঙ্গে শালীন কথাবার্তা বলতে হবে। আচার-আচরণে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে এসেছে :

قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بن سلام: أن الله لما أراد هدي زيد بن سعية قال زيد لم يبق شئ من علامات النُّبوة إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ لَمْ أُخْبَرْهُمَا مِنْهُ: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، ولا يزيده شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا.

قَالَ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ فَأَعْرِف حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ، فَذَكَرَ قِصَّةَ إِسْلَافِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مالاً في ثمرة، قَالَ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ - وَهُوَ فِي جِنَازَةٍ مَعَ أَصْحَابِهِ - وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، وَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ أَلَا تَقْضِينِي حَقِّي؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكُمْ بَنِي

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمُطْلٌ، قَالَ فَنَظَرَ إِلَيَّ عُمَرُ وَعَيْنَاهُ يَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ.

ثُمَّ قَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْمَعُ، وَتَفْعَلُ مَا أَرَى؟ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَوْلَا مَا أحاذر لومه لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ وَتَبَسُّمٍ.

ثُمَّ قَالَ: " أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ، اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ.

وَزِدْ عشرين صاعا من ثمر " فأسلم زيد بن سعية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَشَهِدَ بَقِيَّةَ الْمَشَاهِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُوُفِّيَ، عَامَ تَبُوكَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালমা (রা.) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যায়েদ ইবনে সাই'য়াকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিলেন, যায়েদ বললেন, নবুওয়তের সব নিদর্শন আমি মহানবী (সা.)-এর চেহারায় অবলোকন করেছি; কিন্তু দুটি নিদর্শন এখনো আমি অনুভব করতে পারিনি।

**এক**. তাঁর ধৈর্য তাঁর অজ্ঞতার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে।

**দুই**. অজ্ঞতা তাঁর ধৈর্যকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

সাহাবী বলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করি,যাতে তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারি। একবার আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে এলাম। আমি তাঁর জামা ও চাদর ধরলাম। তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে এক জানাযায় ছিলেন। আমি তাঁর দিকে রুক্ষ চেহারায় তাকালাম এবং বললাম, হে মুহাম্মদ! তুমি কি আমার ঋণ আদায় করবে না? আল্লাহর কসম! তোমরা বনি মুত্তালিব টালবাহানার লোক।

এ সময় ওমর (রা.) আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারায় চক্ষু ঘোরাফেরা করছে ঘুরন্ত নক্ষত্রের মতো, অর্থাৎ রাগে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন। ওমর (রা.) আমাকে বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন! তুমি কি রাসূলকে এমন কথা বলছ, যা আমি শুনছি? তুমি কি এমন কিছু করছ, যা আমি দেখছি? আল্লাহর কসম! মহানবী (সা.) আমাকে বকা না দিলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।'

রাসূল (সা.) তখন ওমরের দিকে শান্ত, ভদ্র ও মুচকি হেসে তাকালেন। তারপর বললেন, 'হে ওমর! আমি ও সে তার চেয়ে উত্তম আচরণের মুখাপেক্ষী। তুমি আমাকে সুন্দরভাবে ঋণ আদায় করতে বলতে পারতে। আর তাঁকে সুন্দরভাবে ঋণ উসুল করার জন্য বলতে পারতে। হে ওমর! তুমি যাও ও তাঁর হক্ক আদায় করো এবং তাকে আরো অতিরিক্ত ২০ 'সা' ফল দাও।'

এটি দেখে যায়েদ ইবনে সা'ইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলের সঙ্গে পরবর্তী সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাবুক যুদ্ধের বছর তিনি ইন্তেকাল করেন।' (ইবনে কাসীর, খ–২, পৃষ্ঠা-৩৮০)

# অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া

অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়াও সুন্নাত। নবী করীম (সা.) অমুসলিম রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদের ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তাদের সেবা করতেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি বালক নবী করীম (সা.)-এর খেদমত করত। যখন সে অসুস্থ হলো, তখন মহানবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন, তার মাথার দিকে বসলেন আর তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো! তখন সে তার পিতার দিকে দেখল। পিতা বললেন, তুমি আবুল কাসেমের অনুসরণ করো, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, আল্লাহর শোকর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস : ১৩৫৬)

সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: «أَيْ عَمِّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ، حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ: عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ» فَنَزَلَتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجَحِيمِ} [التوبة: 113]. وَنَزَلَتْ: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص : 56]

হজরত ইবনুল মুসায়্যিব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এল নবী (সা.) তাঁর দরবারে গেলেন। তাঁর কাছে আবু জাহল বসা ছিল। তখন তিনি বললেন, হে চাচা! কালেমা পড়ো, আমি তা দ্বারা আল্লাহর দরবারে আবেদন করব।

তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হচ্ছ? তারা তাঁকে বারবার তা স্মরণ

করিয়ে দিল। তাই আবু তালিব শেষ কথা বলল, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মে ইন্তেকাল করছি।

তখন মহানবী (সা.) বললেন, আমি আপনার জন্য পাপ ক্ষমা চাইব নিষেধাজ্ঞা আসা পর্যন্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হলো "নবী ও ঈমানদারের উচিত নয়, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাওয়া, যদিও তারা আত্মীয়স্বজন হয়।' (বুখারী, হাদীস : ৩৮৮৪)

এভাবে তিনি মৃত্যুর সময় তাঁদের দেখতে গিয়ে ঈমানের দাওয়াত দিতেন এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

## অমুসলিম মৃতদের সম্মান করা

অমুসলিম জীবিতের যেমন হক্ব রয়েছে, তেমনি মৃতেরও হক্ব রয়েছে। তাদের দাফনে সহযোগিতা করতে হবে এবং তাদের জানাযাকেও সম্মান দিতে হবে। কেননা তারা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত।

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا«

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে বর্ণিত, সাহল ইবনে হুনাইফ ও কায়েস ইবনে সাদ কাদেসিয়াতে বসা ছিলেন।

তখন তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে কিছু লোক অতিক্রম করল। তাঁরা দুজন দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের বলা হলো, ইনি হলো কাফের।

তাঁরা বললেন, মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে একসময় এক জানাযা নেওয়া হয়েছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

তাঁকে বলা হলো, এটা তো এক ইহুদির জানাযা।তখন তিনি বললেন, এটা কি প্রাণী নয় (মানব নয়)?’ (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩১২)

## অমুসলিমদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ

যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে জিম্মি হিসেবে (মুসলিম রাষ্ট্রের আইন মেনে) বসবাস করে, তাদের হত্যা করা যাবে না।

তেমনি যারা ভিসা নিয়ে আমাদের দেশে আসে,তাদের হত্যা করা যাবে না। তাদের জানমালের নিরাপত্তা মুসলমানদের মতোই অপরিহার্য।

ইমাম বায়হাকি (রহ.) সুনানে কুবরা নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ: فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَجَاءَ أَخُوهُ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ، قَالَ: فَلَعَلَّهُمْ هَدَّدُوكَ وَفَرَّقُوكَ وَفَزَّعُوكَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ قَتْلُهُ لَا يَرُدُّ عَلَيَّ أَخِي، وَعَوَّضُونِي فَرَضِيتُ. قَالَ: " أَنْتَ أَعْلَمُ مَنْ كَانَ لَهُ ذِمَّتُنَا فَدَمُهُ كَدَمِنَا، وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا"

হযরত আবু জানুব আসাদি (রহ.) থেকে বর্ণিত, আলী (রা.)-এর দরবারে এক মুসলিমকে হাজির করা হয়, যে একজন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করেছে। এ হত্যার প্রমাণও পাওয়া গেছে।তখন তিনি তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।এ সময় মৃত ব্যক্তির ভাই এল এবং বলল, আমি তাকে ক্ষমা করছি।

তখন তিনি বললেন, হয়তো তার পরিবার তোমাকে ধমক দিয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করেছে, হুমকি দিয়েছে। সে বলল, না। কিন্তু তাকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না। আর তারা আমাকে 'দিয়াত' (রক্তপণ) দিয়েছে। তাই আমি রাজি হয়েছি।

আলী (রা.) বললেন, 'তুমি ভালো করেই জানো, যেসব অমুসলিম আমাদের রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে থাকবে, তাদের জীবন আমাদের মতো, তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতো।'

(বায়হাকী, হাদীস : ১৫৯৩৪)

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধি ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (বুখারী, হাদীস : ৩১৬৬)

عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"

হযরত আবু বাকারা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২০৬৪৮,২০৩৭৭)

## অমুসলিম বন্দিদের সঙ্গে সদাচার

কোনো কারণে যদি তাদের কোনো লোক বন্দি হিসেবে মুসলমানদের অধীনে আসে তখন তাদের বন্দিদের সঙ্গে সদাচার করত হবে। তাদের আহার করাতেও সদকার পুণ্য রয়েছে। বরং যেকোনো প্রাণীকে আহার করাতে সদকা রয়েছে।

কারণ প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ মর্যাদাবান। তাই তাদের অনর্থক নষ্ট করা নিষেধ।

কাতাদাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত,

عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8] قَالَ: لَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْأُسَرَاءِ أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِمْ، وَإِنَّ أَسْرَاهُمْ يَوْمَئِذٍ لِأَهْلُ الشِّرْكِ

'তারা আহার করায় আল্লাহর মুহাব্বাতে মিসকিন ইয়াতিম ও বন্দিদের। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে বন্দিদের সঙ্গে ভালো আচরণ করার জন্য বলেছেন। আর তখনকার বন্দিরা মুশরিকই ছিল।'

(তাফসীরে তাবারী : ২৪/৯৭,২৩/৫৪৪)

বন্দিদের সঙ্গে ভালো আচরণের একটি দৃষ্টান্ত বুখারী শরীফে এভাবে এসেছে,

أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ حَتَّى

كَانَ بَعْدَ الغَدِ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ» فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ البِلاَدِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ العُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ، قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ وَاللَّهِ، لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ، حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) নজদের দিকে অশ্বারোহী একটি দল পাঠালেন, তখন বনী হানীফার ছুমামা ইবনে উছাল নামক ব্যক্তিকে তাঁরা আটক করলেন। তাঁরা তাকে মসজিদের একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। নবী (সা.) তার কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমার কী ধারণা, হে ছুমামা? তখন সে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার ভালো ধারণা রয়েছে। যদি আপনি হত্যা করেন, তাহলে একজন হত্যার উপযুক্তকে হত্যা করবেন। আর যদি ইহসান করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে মুক্তি দেবেন। যদি আপনি মাল চান, তাহলে যা ইচ্ছা চান।

এভাবে দ্বিতীয় দিন অতিক্রম হলো।

মহানবী (সা.) তাকে বললেন, তোমার কী ধারণা ছুমামা! তখন সে বলল, কথা তো আমি আগেই বলেছি, যদি মুক্তি দেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে মুক্তি দেবেন। মহানবী (সা.) তাকে রেখে গেলেন। পরবর্তী দিন তিনি তাকে বললেন, ছুমামা তোমার কী ধারণা? তখন সে বলল, আগেই তো বলেছি।

তখন তিনি বললেন, তাকে মুক্তি দাও। মুক্তি পাওয়ার পর সে মসজিদের একটি নিকটবর্তী খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করল, তারপর আবার মসজিদে প্রবেশ করল। আর সাক্ষ্য দিল আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই ও মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।

অতঃপর বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম আমার কাছে পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারার চেয়ে ঘৃণিত চেহারা দ্বিতীয়টি ছিল না। এখন আমার কাছে আপনার চেহারা সবচেয়ে প্রিয় হয়ে গেল। আমার কাছে পৃথিবীতে আপনার ধর্মের চেয়ে ঘৃণিত ধর্ম ছিল না। এখন আপনার ধর্ম আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্মে পরিণত হলো।

আল্লাহর কসম! আপনার শহরের চেয়ে ঘৃণিত শহর ছিল না। এখন আপনার শহরের চেয়ে প্রিয় শহর নেই। নিশ্চয়ই আপনার অশ্বারোহী দলের হাতে আমি পাকড়াও হয়েছি এখন আমি ওমরা করার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি। আপনি কী বলেন? তখন নবী (সা.) তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং তাকে ওমরার অনুমতি দিলেন।

যখন সে মক্কায় এল, একজন তাকে বলল, তুমি তো পথভ্রষ্ট হয়েছ। তখন সে বলল,না, বরং আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি মুহাম্মদের হাতে, আল্লাহর কসম! ইয়ামামা থেকে একটি গমের দানাও রাসূল (সা.)-এর অনুমতি ছাড়া তোমরা পাবে না।’ (বুখারী, হাদীস : ৪৩৭২)

এ রকম অসংখ্য উদারতা ও সদাচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

## ইসলামের উদারতায় প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের ইসলাম গ্রহণ

হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রের কয়েকজন সরদার মারা যায়। কেউ কেউ পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দিরূপে এবং মালামাল গনিমত হিসেবে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। এর মধ্যে ছিল ছয় হাজার বন্দি, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজারেরও বেশি বকরি এবং প্রায় চার মণ রুপা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু সুফিয়ান বিন হারবকে গনিমতের এসব মালামালের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তার পরও হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রদ্বয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে জড়ো হয়; কিন্তু সব জায়গায় তারা পরাজিত হয়।

শেষ পর্যন্ত তায়েফের এক মজবুত দুর্গে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ১০ থেকে ২০ দিন এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের ছিল না।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এদের বদদু'আ দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এদের হেদায়েতের জন্য দু'আ করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন।

প্রথমে তিনি মক্কা গিয়ে ওমরা পালন, তারপর মদিনা প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (সা.)-এর দু'আ কবুল করে তাদের হেদায়েত দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন জি'রানা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে।

ঐতিহাসিক হুনাইনের যুদ্ধের পর নজিরবিহীন এ ঘটনা সংঘটিত হয়। যুদ্ধের পরই হাওয়াজিন গোত্রের অবশিষ্ট লোকেরা সদলবলে ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়।

সত্য, ন্যায় ও হেদায়েতের এই মিছিলে দলনেতা মালিক বিন আউফও যোগ দেন। যুদ্ধের প্রায় ২০ দিন পর এই ঘটনা ঘটে।

ইতিমধ্যেই তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ গনিমত হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

এখানে নতুন সংকট দেখা দেয়, মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তারা তাদের সম্পদের দাবি জানায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের দুটি বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে বলেন। হয়তো তারা তাদের ওই সম্পদ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে অথবা সম্পদের পরিবর্তে তাদের ছয় হাজার যুদ্ধবন্দিকে ফেরত নিয়ে যাবে।

তারা তাদের বন্দিদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হয়।

মুজাহিদদের ছাড়াও এই বিপুল সম্পদ থেকে সেসব নওমুসলিমদেরও একটা বিশেষ অংশ দেওয়া হয়, মক্কা বিজয়ের পর যারা মুসলমান হয়েছিল। তাদের অনেককে রাসূলুল্লাহ (সা.) ১০০ করে উট দান করেছেন।

হাওয়াজিন গোত্রের নেতা মালিক বিন আউফকেও ১০০ উট দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নিজ গোত্রের সরদারও বানিয়ে দেন। আগেও তিনি সেই গোত্রের সরদার ছিলেন, তবে সেটা ছিল অমুসলিম হিসেবে। এবার তিনি একই গোত্রের সরদার হয়েছেন মুসলমানদের নেতা হিসেবে (ইবনে কাছীর, তাফসীরে মুনীর)।

## অমুসলিমদের দান-সদকা করার বিধান

সদকা শব্দটি সাধারণত ফল দান-অনুদান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে যেকোনো অমুসলিমকে দান করা সব আলেমের ঐকমত্যে বৈধ।

অমুসলিম প্রতিবেশী আক্রান্ত হলে, তারা বিপদগ্রস্ত হলে মুসলমানদের উচিত তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

আর সদকা শব্দটি কখনো যাকাত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এটি অমুসলিমদের দেওয়া যায় না। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি।

কেবল যাকাতের ক্ষেত্রে বিধানের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা হয়েছে, অন্যথায় যেকোনো দান-সদকা, এমনকি ফিতরাও অমুসলিমদের দেওয়া যায়।

এখানে লক্ষণীয় যে যাকাত দিতে হয় বছরে একবার। মুসলিম ধনীদের মধ্যে কারো প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপা কিংবা এর অর্থমূল্য পরিমাণ সম্পদ মজুদ থাকলে এবং এর ওপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়।

এটি ধনীদের সম্পদ থেকে ২.৫ শতাংশ আদায় করতে হয়।

অন্যদিকে সদকা বছরের যেকোনো সময় অনির্দিষ্ট পরিমাণ মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে দেওয়া যায়।

তাছাড়া সদকা ধনীরা ছাড়াও যে কেউ আদায় করতে পারে।

## অমুসলিম অত্মীয়-স্বজনের অধিকার

সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে গিয়ে নানা শ্রেণির, নানা পেশার, নানা মত ও পথের মানুষের মুখোমুখি হতে হয় । মুখোমুখি হতে হয় অমুসলিমদেরও। অমুসলিম ব্যক্তি হতে পারে কোনো মুসলমানের প্রতিবেশী।

যদি কারো প্রতিবেশী কিংবা কোনো আত্মীয় অমুসলিম হয়, ইসলামের নির্দেশনা হলো "তার সঙ্গেও প্রতিবেশী বা আত্মীয়তার অধিকার রক্ষা করে চলতে হবে।"

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।' (সহীহ বুখারী : হাদীস ৬১৩৮)

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সম্পর্ক রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'তোমার পিতামাতা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান (দলিল ও প্রমাণ) নেই, তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সঙ্গে সদাচরণ করো। আর এমন ব্যক্তির পথ অনুসরণ করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত করব, যা তোমরা করতে।' (সূরা লোকমান : ১৫)

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) থেকে বর্ণিত,

أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ»

তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে এলেন রাসূলের যুগে মুশরিক অবস্থায়। তখন আমি রাসূল (সা.) থেকে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে বললাম, আমার মা এসেছেন, তিনি ইসলাম ধর্মবিমুখ। আমি কি তাঁর আত্মীয়তা রক্ষা করব? তখন তিনি বলেন– হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রেখো।

(বুখারী, হাদীস : ২৬২০)

ইসলামের প্রধান লক্ষ্য মানবতার কল্যাণ। মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে বৈরী মনোভাব দূর করার জন্য পারস্পরিক লেনদেন, দান-অনুদান বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। মানবতার বাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গঠনের বিকল্প নেই।

## সেকুলারিজম না শারিয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম?

সেকুলারিজম মতবাদে বিশ্বাসিরা সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা এভাবে ব্যাক্ত করে যে :

Secularism is independent of Religion.

Secularism is not dependent on Religion.

Secularism is not subordinate to Religion.

Secularism is not controlled by Religion.

A Secular person does not belong to any Religion.

অর্থাৎ সেকুলারিজম ধর্ম থেকে পৃথক। ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়। ধর্মের অধীন নয়। ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

একজন সেকুলার ব্যক্তি কোনো ধর্মের উপর বিশ্বাসী নন।

সেকুলারিজম এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন:

অর্থাৎ সেকুলারিজম ধর্ম থেকে পৃথক। ধর্মের উপর নির্ভরশীল নয়। ধর্মের অধীন নয়। ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

একজন সেকুলার ব্যক্তি কোনো ধর্মের উপর বিশ্বাসী নন।

সেকুলারিজম এমন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন:

১. যা মানবরচিত একটি মতবাদ।

২. যার আওতা (scope) ইহজগৎ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ মতবাদ ইহজগতের বাইরে আর কোনো জগতের (পরকালের) অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।

৩. এ মতবাদে বিশ্বাসীগণ মানুষ ছাড়া বাইরের কোনো শক্তির নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন মনে করে না। অন্য কথায় ওহিলব্ধ জ্ঞান অস্বীকার করে।

৪. এর আওতাধীন বিষয়গুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইহজগতেই সম্ভব। ইহজগতের জন্য যা ভাল ও উপকারী কেবল তারই অনুসন্ধান করতে হবে।

৫. মানবীয় সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ হতে হবে বস্তুগত উপায়ে এ জগতে।

৪. এর আওতাধীন বিষয়গুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইহজগতেই সম্ভব। ইহজগতের জন্য যা ভাল ও উপকারী কেবল তারই অনুসন্ধান করতে হবে।

৫. মানবীয় সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ হতে হবে বস্তুগত উপায়ে এ জগতে।

৬. অদৃশ্য বিশ্বাস ও মানব প্রগতি এক সাথে চলতে পারে না।

৭. ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কুসংস্কারমূলক এবং বস্তুগত উন্নতির প্রতিবন্ধক।

৮. মানুষ কেবল মানুষ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির নিকট দায়ী নয়।

৯. সামষ্টিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনায় আনা যাবে না।

সেকুলারিজম রাষ্ট্র কে ধর্ম থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন করে এরং ধর্মকে ব্যাক্তিগত বলে।কিন্তু স্পষ্ট করে বলতে গেলে সেকুলারিজম নিজেই একটি ধর্ম।আর এই ধর্মের শরিয়ত হলো হিউম্যানিজম।

এই ধর্মের খোদা হলো মানুষ এবং শরিয়তের উৎস হলে আকল।এই মানব তৈরি ধর্ম অন্য ধর্মের উপর তার কতৃর্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং সেকুলারিজম নিজেই একটা ধর্ম

এই ধর্মে অন্য সকল ধর্মবিশ্বাসিরা খুব সহজে গ্রহন করলেও ইসলামের সাথে বিরোধিতা চলছে সেকুলারিজমের জন্মকাল থেকেই ।

একজন মুসলিম এই মতবাদ কখনো গ্রহন করেনা বরং এর বিরোধিতা করে কারন : ইসলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জিবন বিধান। ইসলাম ছাড়া বাকি সব ধর্মই মানব রচিত এবং বিকৃত।

ইসলামি শারিয়াহ আল্লাহ প্রদত্ত। যার উৎস কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামি শারিয়াহ এমন এক জিবন বিধান যা একজন মুমিনের ঈমান আকিদার সংরক্ষণ করে।পাশাপাশি অন্য সকল ধর্মবিশ্বাসি দের নিজ নিজ ধর্ম পালনে বাধা দেয় না।ইসলামি শারিয়াহ ন্যায় বিচার এবং সুষমনীতি নিশ্চিত করে সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে।ন্যায় বিচার এবং সুষমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ধর্ম কোনো বাধা হয় না।কিন্তু সেকুলারিজম তা করে না।শারিয়াহ সামগ্রিক মানবাধিকার সংরক্ষণ করে

। যা অন্য কোনো মতবাদের নীতি করতে পারেনা, করেও না।ইসলামি শারিয়াহ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ও বিকাশের সুবিধা নিশ্চিত করে। অপর পক্ষে সেকুলারিজম শুধু সেকুলারদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ব্যস্ত থাকে।

ইসলামি শারিয়াহ ব্যাক্তির

ব্যক্তিগত জীবন,পরিবার ও বংশ,সামাজিক আচরণ ও পারস্পারিক সম্পর্ক,সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র,সামগ্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র,আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন, এবং নিরাপত্তা নিশ্চত করে। সুতরাং শরিয়ার প্রয়োগ ক্ষেত্র মানুষের সামগ্রিক জীবন।

ইসলামি শরিয়া মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত।যা কোনো মানব রচিত আইন বা দর্শন করতে পারেনা।ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ (perfect) জীবন বিধান। ইসলামি শরিয়া আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল আইন। তাই বলা যায় ইসলামি শারিয়াই উত্তম।

সহায়ক সোর্স
#কুরআন
#কুরআনের তাফসির
#হাদিস
#ইসলাম প্রতিষ্ঠা
#অপরিহার্য শরীয়াহ
#ইসলামি শারিয়াহ কী, কেন,কিভাবে?
#সংশয়বাদী
#হিউম্যান বিয়িং
#সেকুলারিজম-অধ্যাপক ফজলুর রহমান
#ইসলাম ও সেকিউল্যরিজম-জাকির নায়েক
#ইসলাম প্রতিষ্ঠা
#অপরিহার্য শরীয়াহ

# https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=123

# https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10666

#
https://muslimbangla.com/article/49/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%
E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%
A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%
A4%E0%A6%BE-%E0%A6%93-
%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-:-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E
0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0
%A7%87-
%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0
%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AF%E0%A6%BE-
%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-
%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0

# https://www.alkawsar.com/bn/article/1064/

# https://www.alkawsar.com/bn/article/862/